স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির ২য় পর্ব আজ রবিবার, মার্চ ১৩, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ
probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

২য় পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

- ৮ -

কনস্ট্রাকশন কোম্পানী আনিসের দেখা হয়ে গেছে। ম্যানেজার হবার সখ ফুরিয়ে গেছে। চাচীর কথামত এবার সে কিছুদিন ঘুরে বেড়াবে। তারপর ধীরে ধীরে চাকুরি খুজবে।

রোববার বিকেলে চাচা তাঁর ভ্যান নিয়ে এসে আনিসকে নিয়ে গেল। এক বাংগালির বাসায় মিলাদের দাওয়াত। তারা আনিসকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ করে বলেছে।

পথে যেতে যেতে চাচা যাদের বাসায় যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে সামান্য ধারনা দিলেন।

ভদ্রলোকের নাম সৈয়দ মুক্তাদির হোসেন, যিনি সৈয়দ সাহেব নামেই পরিচিত, এদেশে এসেছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। এসে কিছুদিন কনষ্ট্রাকশনের কাজ করেছে। তারপর নিজেই ব্যবসা ফেদে বসেছেন। তার কোম্পানীতে এখন চল্লিশজন লোক কাজ করে। অনেকগুলো বাড়ীর মালিক। তিনটে গাড়ি ইত্যাদি একটা বড় রকমের ফিরিস্তি দিলেন। আধ ঘন্টার মধ্যেই তারা এসে পৌছে গেল সৈয়দ বাড়ীর সামনে। বাড়ীর সামনে পার্কিং থাকায় ভ্যান নিয়ে রাস্তায় চক্কর খেতে হয়নি।

ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই এক ভদ্রলোক এসে চাচার সাথে কোলাকুলি করে বললেন, এত দেরী হল কেন চাচা? মুরুব্বিরা আগে না আসলে তো ঠিক জমেনা।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপর হবে। মাথায় কাচা পাকা চুল। স্যার সৈয়দ আহাম্মদের মত দাঁড়ি। পরনে পাকিস্তানী সেলোয়ার-কোর্তা, মাথায় পাকিস্তানি কারুকার্যখচিত টুপি। প্রথমে বাংগালি বলে অনুমান করা যায়না। কোলাকুলি শেষে চাচা বললেন, আনিসকে নিয়ে আসতে

একটু সময় লাগল, তাই দেরী হয়ে গেল। তারপর আনিসের দিকে ফিরে বলল, ইনি সৈয়দ সাহেব। তোমাকে দেখার জন্য খুব ইচ্ছে ছিল। সৈয়দ সাহেব হাত মিলিয়ে আনিসকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে হাত দিয়ে ভেতরে আর একটা রুম দেখিয়ে বসতে বললেন।

ভেতরে বিরাট লিভিং রুম। কয়েকটা দামী সোফা দিয়ে ভর্তি। যে ধরনের সোফা সেট রাখা হয়েছে এগুলো সাধারন বৈঠকখানায় রাখলে আর জায়গা থাকার কথা নয়। এ ঘরে দেখা যায় তিনটে সেট। তিন রকমের। দেখলেই বুঝা যায় খুব দামি। তিন দিকে ঘুরিয়ে এমন ভাবে সেট করা হয়েছে মনে হয় কোন কনফারেন্স হল। মেঝেতে দামি কার্পেট। হাটতে গেলে পা ডুবে যায়। লিভিং রুমের শেষ মাথায় একটা সিড়ি উপরে উঠে গেছে। সবগুলো সোফাতেই মেহমান বসে আছেন। সকলের মাথায় টুপি। বেশিরভাগই সৈয়দ সাহেবের নকল। কে কার অনুসারি বুঝা গেলনা। তবে এখানে আগত সকলেই যে একই পথের অনুসারি তা পরিষ্কার বুঝতে পারল আনিস। সেলাম দিয়ে ভেতরে যেতেই সকলের আলাপে যতি পড়ল। সকলেই একবার আনিসের দিকে তাকাল। এক পাশে একটা সোফাতে বসতেই একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সারেং ভাইর ভাতিজা?

আনিস বলল, জ্বি।

আর একজন বলল, আপনার কথা শুনেছি। কেমন লাগছে এ দেশ?

আনিস বুঝতে পারল এখানে প্রায় অনেকেই জানে আনিসের আসার খবর। তাহলে এরা সকলেই চাচার ঘনিষ্টজন। ছেলেমেয়ের হৈচৈ শুনে ডান দিকে তাকিয়ে দেখল অনেক গুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। কারও পরনে পাকিস্তানি বস্ত্র এবং টুপি। নিশ্চয়ই এদের মা বাপ তাদেরকে এমনিভাবে মানুষ করছে। বৈঠকখানার যে দিকটা খোলা সেদিকে আর একটা বড় কামরা। মাঝখানে কোন দরজা নেই। একটা পাতলা পরদা ছিল এখন ফিতে দিয়ে বাধা থাকায় দুটো কামরাকে আরও বড় দেখায়। সে কামরায় একটা টেবিল আর অনেকগুলো চেয়ার। নিশ্চয়ই ওটা ডাইনিং রুম। টেবিলের পরেই একটা দরজা। অনেক মহিলার ভীড়। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, কেউ টেবিলে খাবার রাখছে। একজন এসে তার একটা বাচ্চাকে শাসন করে গেল। যেন একটা বিয়ে বাড়ী। বিরাট উৎসব।

ওয়ালেকুম সেলাম বলে চোখ ফিরিয়ে আনিস দেখে তার পাশে আরও দুজন মৌলানা এসে তশরিফ নিলেন। তাদের পরনে বাংলাদেশি পাঞ্জাবী। তার পরই চাচা এসে বসলেন তার উল্টোদিকে। তখন সকলের দৃষ্টি চলে গেছে চাচার দিকে। চাচার সাথে আলাপে সবাই ব্যস্ত। পাশের রুমে একটা বাচ্চা দৌড়াতে গিয়ে টেবিলে ধাক্কা খেয়ে চিৎকার করে পড়ে গেছে। আনিস ভাবছে তাকে উঠাতে যাবে কিনা। এমন সময় এক মহিলা দৌড়ে এল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দেখছে কোথায় লেগেছে। আনিস থ হয়ে গেল। মানুষের এত রূপ হয়! এত অলংকার পরে! পরনে খুব দামী একটা শাড়ি। এ শাড়ির কি নাম তা আনিস জানে না। শাড়ী সম্বন্ধে তা কোনই ধারণা নেই। তবে মানিয়েছে খুব! শাড়ির সাথে ম্যাচ করে ব্লাউজ। বুকের অর্ধেকটা সোনার অলংকারে ঢাকা। হাতের আংটির সাথে আলোর ঝলকানি চোখে এসে ধাধা লাগে। একি কোহিনূর? দুহাতের অর্ধেক চুড়িতে ভর্তি! কত অলঙ্কার! বাংলাদেশে এমন সুন্দরী আছে? কত আর হবে বয়স! বাইশ তেইশ! কৈ, সে নিজে তো খুঁজে পায়নি! গত তিনটে বছর আত্নীয়স্বজন মিলে খুঁজল। কোথায়ও মনের মত পাত্রী মেলেনি। মহিলার দিকে সে তাকিয়েই আছে।

সৈয়দ সাহেবকে একটু ডাকুন তো!

এ কি গানের সুর নাকি আদেশ? মানুষের কণ্ঠস্বর কত রকমের হয়! এ কণ্ঠস্বরে গানের সুর ভেসে আসে। প্রতিটি শব্দে যেন ছন্দ নাচে! যেন যাদু করা কণ্ঠ! বহুদূরে চলে গেলেও কানে বাজতে থাকবে! শব্দের রেশ থেকে যাবে অনেকক্ষন। আনিসও হয়ত চলে গেছে বহুদূর। কণ্ঠ আবার ছন্দের তালে নেচে উঠল!

এই যে ভাই, সৈয়দ সাহেবকে একটু ডেকে দিন তো!

মহিলা আনিসের দিকে তাকিয়ে তাকেই বলছে কথাটা। তাহলে আনিসকেই আদেশ করছে বুঝা গেল।

আনিস তাড়াতাড়ি উঠে গেল। দরজার বাইরে সৈয়দ সাহেবকে পাওয়া গেল। আনিস বলল, আপনাকে ডাকছে ভেতরে। বাচ্চা ব্যথা পেয়েছে।

সৈয়দ সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। কপালের এক দিকে লেগে কালো হয়ে গেছে। দেখেই বললেন বরফ আন। বাচ্চাটাকে সৈয়দ সাহেবের কোলে দিয়ে মহিলা বরফ নিয়ে এল। একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে বরফটা ধরে রাখল কিছুক্ষন। তারপরর মহিলার কোলে দিয়ে বলল, এখন ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর ব্যথাও তেমন সিরিয়াস নয়। ঠিক হয়ে যাবে। আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, এই তোমার ভাবী। তার স্ত্রীকে বলল, সারেং চাচার ভাতিজা। বলে তিনি চলে গেলেন মেহমান আপ্যায়নে।

মহিলা আনিসের দিকে চোখ তোলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। বললেন, আমিও অনুমান করে নিয়েছি আপনি আনিস ভাই। আর কি কান্ড দেখুন, পরিচয় হবার আগেই আপনাকে হুকুম করে কাজ করিয়ে নিলাম।

প্রয়োজনে তাই করতে হয়। আমার নামও জানেন দেখছি।

নাম জানি। আরও অনেক কিছু জানি আপনার সম্মন্ধে।

আর কি জানেন?

জানি আপনি ছাত্র রাজনীতি করে দুবার জেলে গেছেন। বেশিদিনের জন্য নয়। বাংলাদেশের প্রায় সব মেয়েই আপনার দেখা হয়ে গেছে। অনেক হাজার টাকা পাত্রীর মুখ দেখাতেই চলে গেছে। যা ও একটা পছন্দ হল সেটাও আপনি পেলেন না। বিয়ের প্রায় সবকিছু ঠিক। এমন সময় সেই পাত্রী এসে আপনাকে তার গোপন প্রেমের কথা বলে দিল। শেষ পর্যন্ত বউ ছাড়াই আপনার আম্মা পাঠাতে রাজি হলেন। এ স-ব জানি। আপনাকে নিয়ে চাচার অনেক চিন্তা। এমন সময় এক মহিলা এসে বলল, ভাবী, ওদিকে একটু আসতে হয়। হোটেল থেকে খাবারেরর গাড়ী এসেছে। কোন্ কোন্ খাবার কোথায় রাখা হবে একটু দেখিয়ে দিন।

খাবার এসেছে পাকিস্তানি হালাল রেষ্টুরেন্ট থেকে। রেষ্টুরেন্টের মালিক সৈয়দ সাহেবের বন্ধু মুহাম্মদ তানভীর খান। তার কোন টাকা ছিলনা রেষ্টুরেন্ট দেবার। সৈয়দ সাহেব টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। অবশ্য টাকা ফেরত পেয়ে গেছে অনেক আগেই। সেখান থেকে খাবার আনলে সৈয়দ সাহেব নাম মাত্র একটা দাম দিয়ে দেন।

ভাবী চলে গেলেন। বলে গেলেন, আনিস ভাই, খাওয়া দাওয়ার পর আমার সাথে দেখা না করে যাবেন না কিন্তু। এখন তো কথা বলারও সময় নেই।

ভাবী যেদিকে চলে গেলেন সেদিকে তাকিয়ে আনিস দেখল সে ঘরে মহিলাদের ভীড়। কেউ সেলোয়ার কামিজ, কেউ শাড়ী, কারও মাথায়

স্কার্ফ। মনে হয় সবাই এসেছে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। অথবা গহনার প্রতিযোগিতায়। কার কত গহনা আছে তাই আজ প্রদর্শন হবে। যদি তাই হয়, তাহলে ভাবীই হবেন বিজয়িনী। যদি সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে ভাবীর সাথে প্রতিযোগিতায় আসার মত কেউ নেই। আনিস ফিরে এসে সোফাতে বসল।

তার মনে হল এখানেও একটা প্রতিযোগিতা চলছে। পাকিস্তানী হবার প্রতিযোগিতা, কপট আল্লাহ ভক্তির প্রতিযোগিতা। কে বেশি ইসলামিক মনোভাবাপন্ন প্রমান করতে পারবে সেই যেন বিজয়ী হবে। এরা কেউ পাকিস্তানী কিনা জানা গেলনা। যদিও সকলেই বাংলায় কথা বলছে। আশরাফুজ্জামান নামে লোকটা অনবরত বলেই যাচ্ছে। কোন হাদিসে কি লেখা আছে, কোনটা সুন্নত, সুন্নত আবার কোন জাতীয়, কোন কোন দোকানে হালাল খাবার ভাল, কোন দোকানে হালাল টুথ পেষ্ট পাওয়া যায় এসব একটা ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় সে এই দলের লিডার। আনিস মনে মনে ভাবল, এখানেও ওরা!

এমন সময় নতুন অতিথি এসে ঢুকলেন। ক্লিন সেভ। পরনে শার্টপ্যান্ট, গায়ে ব্লেজার। সালাম দিয়ে কয়েক মুহূর্ত ঘরের পরিবেশটা দেখে নিলেন। মনে হল অন্য জগতের মানুষ তিনি। এখানে তার পরিচিত শুধু একজনই আছে মনে হল। সে কলিমুল্লা। কলিমুল্লা বলল, বসেন ভাই। সৈয়দ সাব এখনই আসবে। আগন্তুকের পোশাকের ধারে কাছে পোষাক পড়া একজনই আছে এই ঘরে। সে আনিস। তাই তিনি আনিসের পাশেই বসলেন। বসেই আনিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে চেনা চেনা মনে হয়। কোথায়ও দেখা হয়েছিল আমাদের?

আনিস বলল আমার তো মনে পড়ে না। কি জানি দেখা হয়ে থাকবে হয়ত।

কোথায় থাকেন?

নস্ট্রেন্ড এভিনিউ।

হয়ত কোন বাসায় বা বাজারে দেখা হতে পারে। কবে এসেছেন আমেরিকায়?

এই তো মাস খানেক হল।

তাহলে তো দেখা হবার কথা নয়। আপনার চেহারাটা খুব পরিচিত মনে হয়। বাংলাদেশে বাড়ী কোথায়?

বাসাবোতে।

বাসাবো কোন্ বাড়ী? মিজানকে চিনেন?

মিজান আমার বড় ভাই। চাচাতো ভাই।

মিজান তোমার ভাই! তাই ত বলি চেহারাটা চেনা চেনা লাগে। মিজানের চোহারার সাথে খুব মিল আছে তোমার। মিজান কি রাশিয়া থেকে ফিরেছে?

না, ফিরেনি। সেখানেই বিয়ে করে একবারে সেটেল্ড হয়ে গেছে।

মিজানের আম্মা কেমন আছেন?

তিনি তো মারা গেছেন আজ চার বছর হল।

একদিন সবাই চলে যায়। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এই তো জীবন! আমরা একজনকে ছাড়া আর একজন এক দিনও থাকতে পারতাম না। আর আজ কত দিন কোন যোগাযোগ নেই!

এসময় কলিমুল্লাহ উঠে এসে সৈয়দ সাহেবের সাথে বাহারের পরিচয় করিয়ে দিল। এই হলেন বাহার সাহেব। উনার কথাই বলছিলাম। খুব ভাল লোক। আপনার অফিসের সব কাজ করতে পারবেন। ব্যাংকে দশ

বছরের অভিজ্ঞতা। সৌদি মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্সে দশ বছর কাজ করেছেন।

ঠিক আছে, আপনি সোমবার আমার অফিসে আসেন। বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাহারের হাতে দিল সৈয়দ সাহেব। তারপর বললেন, অফিসে আসলেই সব কথা হবে।

অতিথিরা আলাপে ব্যস্ত। কেউ আলোচনা করছে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে, কেউ করছে ইসলামের সুক্ষ ধারা-উপধারা নিয়ে, দুজনের মাঝে হচ্ছে টুথ পেস্ট নিয়ে। কোন কোন টুথ পেস্ট ইসলামিক কায়দায় হালালভাবে তৈরি। একমাত্র সেসব টুথ পেস্টই ব্যবহার করা উচিত বলে তিনি এগুলোর নাম বাতলে দিচ্ছেন। বাহার একসময় উঠে আনিসকে ইশারায় বাইরে ডাকল।

বাহার বলল, চল ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি। একটা সিগারেট টেনে আসি। এখানে যেসব আলোচনা হচ্ছে তাতে আমার ভাল লাগবে না। ফতোয়া ছাড়ছে! বাচ্চাদের আরবী শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায়! বাবা, এতই যদি ধার্মিক হও তাহলে দেশে চলে যাওনা কেন? নচ্ছারের দেশে পড়ে আছ কেন? কথা বলতে বলতে একটা গলি পেরিয়ে একটা গ্রোসারির সামনে এসে দাঁড়াল। এক প্যাকেট রথম্যান কিনে বাহার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তাহলে তুমি ওপি ওয়ানে এসেছ? মানে একবারে আমেরিকার নাগরিক হতে যাচ্ছ! খুব আনন্দের কথা।

আনিস এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল, আপনি এ ধরনের জলসায় কেন, এবং কি করে? আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনাকে এখানে দেখব আমি কোনদিন আশা করিনি। মা আর চাচির কাছে শুনেছি আপনি এবং মিজান ভাই এক সাথেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ রাতে। মিজান ভাইর কথা উঠলেই আপনার কথা এসে যায়। চাচি বলত মিজানটা যদি সৌদিতে যেত তাহলেও তো মাঝে মাঝে আসতে পারত। গেল তো গেল বহুদূর।

লেখাপড়া কতটুকু করেছ? ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলে?

ইংলিশে এম এ করেছি। নিজের অজান্তে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

কথাবার্তায় মনে হচ্ছে তুমি বেশ মোটিভেটেট। এই বাসায় এসে আমি একেবারে বোকা হয়ে গেছি। সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলেনি কলিমুল্লা। সৈয়দ সাহেবের একজন লোকের দরকার। তাই। এখানে এসে যা দেখলাম তাতে সিদ্বান্ত নিয়েছি এধরনের লোকের সাথে আমি কাজ করব না। এখন বুঝলাম আমাকে গায়ে পড়ে কেন এত সাহায্য করছে। কারন আমার নামের পেছনে পদবীটা। তারা মনে করেছে আমি তাদের মতই একজন মোল্লা। ওরা তো আমার পরিচয় জানে না। এখানে কাউকে বলিও না।

বলেন কি! আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এ কথা কাউকে বলেননা! কেন? এ আপনার অহংকার!

অহংকার নিজের কাছেই আছে। এখানকার অবস্থা লক্ষ্য করছি।ববং একে সন্মান প্রদর্শন করার জন্যই এখানে প্রচার করিনা। আমি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম এ কথা এখানে মানুষ জানলে আমার দাম খুব বেড়ে যাবেনা। ববং একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠবে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকর্মে মানুষের ধারনা এমন জন্মেছে। এখানে কয়েকটা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আছে। এসব সংসদে যে-কেউ গিয়ে বলতে পারে সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। কারন এখানে পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয়না। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ছেলের জন্ম সেও ঐ সংসদের সদস্য,

একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় দেশে কার কি ভূমিকা ছিল তার প্রমান সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেখা গেছে রাজাকারের সহযোগীরাও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য। অবশ্য সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাও কিছু আছে। তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অমুক্তিযোদ্ধারা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে। যারা রাজাকার বা তার সহযোগী ছিল তারাই বেশি লাফালাফি করে। নিজেদের অতীতকে ঢাকার জন্য দেশ দেশ করে চিৎকার করে বেড়ায়। নিজকে দেশদরদি প্রমান করার যত রকমের ফন্দি, যত রকমের ছলচাতুরি আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে সদা ব্যস্ত। তারা পরস্পরের পিঠ চুলকোয়।

আসল মুক্তিযোদ্ধারা এসবের প্রতিকার করেনা কেন?

কেন করবে? তাদের স্বার্থ যে চলে যাবে। নেতা হতে পারবেনা। দেশে তো তাদের কোন পরিচয়ই ছিলনা। এখানে এসে কেউ কমান্ডার, কেউ ডেপুটি কমান্ডার হয়েছে। আর ওই সহকারীরা তাদের মাথায় নিয়ে নাচে, তাদের নাম হয়। নেতৃত্ব নিয়ে মারামারি হয়। নিজেদের মাঝে দল হয়, সেই দল নিয়ে আলাদা হয়ে আর একটা সংসদ হয়। এখন নিউইয়র্কে দুটো মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। একটা বি এন পি সমর্থিত, আর একটা আওয়ামীলীগ সমর্থিত। বলতে পার একটা বি এন পি আর একটা আওয়ামীলীগ। আর একটা ছিল মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ। তাদের বার্ষিক সম্মেলনে অনৈক্যের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা একে অপরের মাথায় চেয়ার ভেঙেছে। সেই অনৈক্যের চেয়ার-যুদ্ধের পর ঐক্যপরিষদের আর কোন খবর কোন কাগজে দেখিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করে ফেলেছে এই অমুক্তিযোদ্ধারা। তাই মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে এখানে গর্ববোধ করিনা।

মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের কাজটা কি? আনিস জিজ্ঞেস করল।

কাজ? মিটিং করা, বক্তৃতা দেয়া, বাংলা কাগজে ছবি সহ নিজেদের নাম প্রকাশ করা। কিছুদিন আগে আওয়ামীলীগ সমর্থিত সংসদ কিছু লোককে সনদপত্র বিতরন করেছে সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য। পরের সংখ্যায় দেখলাম অনেকে প্রতিবাদ পাঠিয়েছে এই বলে যে এদের মাঝে অনেকেই রাজাকার বা রাজাকারের সহযোগী ছিল, তাদের কোন অবদান নেই। সংসদ এ প্রতিবাদের জবাবে যা লিখেছে তাতে রাজাকার উপাধি ঠেকাতে পারেনি। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে যারা এখানে, এই আমেরিকায় ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেনি, সংশয়ের দুটানায় দুলছিল, তারা যখন দেখল বাংলাদেশ হয়েই গেল, তখন থেকেই বাংলাদেশ বলে চিৎকার করে বেড়াতে লাগল। আর এখন এত বছর পর নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবীই করেনা, তারা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে সনদপত্রও পেয়ে গেছে।

সনদপত্র দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তাদেরকে, আনিস উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আরে বাবা সনদ পত্র দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে বলে শুকরিয়া আদায় কর। তারা যে বীরবিক্রম জাতীয় উপাধি দেয়নি সেটাই বড় কথা। দিলে কে কি করত? যারা সনদ দিয়েছে তারা জানে মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের ভুমিকার কথা, আর যারা গ্রহন করেছে তারাও জানে তারা কে। অতএব একজন আর একজনের পিঠ চুলকাবে।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে এসব লিখব আমি, বলে বাহারের দিকে তাকিয়ে রইল আনিস।

কেন্দ্রীয় অফিসে লিখবে? সেখানেও তো দল। তারা এসবের তোয়াক্কা করেনা। তারা চায় দল ভারি করতে। দলে লোক চায়, কে কি ছিল তা

জানতে চায়না। দল ভারী থাকলে ওরাও গদীনসীন থাকতে পারে। তাছাড়া অমুক্তিযোদ্ধারা তো নিজেরা কিছু বলেনা, দুএকজন আসল মুক্তিযোদ্ধা দিয়েই বলায়। তাদের সংখ্যা বেশি। তোমার আমার কথা জোর পাবেনা। ওরাই টিকবে। তাছাড়া এখান থেকে ডলার যায়।

তাহলে এর প্রতিকারটা কি?

প্রতিকার করার কোন পথ দেখছি না। তবে প্রবাসে বিশেষ করে আমেরিকাতে অর্গানাইজডভাবে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভুমিকা কি ছিল তা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। এর ইতিহাস কেউ লেখেনি। আমার ইচ্ছে আছে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে প্রবাসীর ভূমিকা নিয়ে কিছু লিখব এবং খুব শীঘ্রই শুরু করব।

কোথায় পাবেন সত্যি ঘটনার ইতিহাস?

যারা এই প্রবাসে একসাথে কাজ করেছিলেন, দু একজন ছাড়া সকলেই জীবিত আছেন। কয়েকজনের সাথে আমি কথাও বলেছি। তারাও নতুন নতুন নাম দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করেন, ওরা কারা, কোথায় ছিল তখন? ইতিহাসের খাতিরেই লিখতে হবে, না হয় প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের কথা বিকৃত হয়ে পরবর্তি প্রজন্মের কাছে পৌঁছবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আপনি কবে এসেছেন এ দেশে? ভাবী বাচ্চা নিয়েই এসেছেন?

এসেছি তো প্রায় চার বছর। সব নিয়ে এক সাথেই এসেছি।

আমি তো সব কিছুতেই হোচট খাচ্ছি। স্বপ্নের সাথে মিলছেনা। কি করব কিছুই বুঝে ঠিক করতে পারছিনা।

এসে যখন পড়েছ তখন সবই দেখবে, বুঝবে। কি ছিল তোমার স্বপ্ন? ডলার? যদি শুধু ডলারের স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে রোজগার করতে পার। এখানে এমন মানুষ আছে যারা দৈনিক ষোল ঘন্টা কাজ করে পয়সা বানাচ্ছে। আর যদি জীবন তৈরি করতে চাও, জীবনকে উপভোগ করতে চাও তাহলে লেখাপড়া করতে হবে। জীবনের ভিত তৈরি করতে হবে। তাহলে সারাজীবন সুখে আরামে কাটবে। এদেশে সকলেই আসে একটা স্বপ্ন নিয়ে। সেটা হল ডলার। তার সাথে আশ্রয় অথবা পলায়ন। পালিয়ে থাকার নিরাপদ নগর এই নিউইয়র্ক। পৃথিবীর সব দেশের অপরাধীরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। নামে বেনামে। প্রকাশ্যে অথবা ছদ্মবেশে। তোমার তো ওসব কোন ঝামেলা নেই। লেখাপড়া কর। দেখবে জীবন এমনিতেই তৈরি হয়ে যাবে।

লেখাপড়া করতে যে ইচ্ছে হয় না!

তাহলে অড জব করতে হবে। জীবনের শেষে দেখবে স্বপ্নের সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই, সুখের সন্ধান মেলেনি।

কিছুদিন ঘুরে ফিরে দেখি কি করা যায়।

এই ক'বছরে আমি ঘুরে দেখেছি। অনেকটা চিনে ফেলেছি আনিস! অনেকে ভুল পরামর্শ দেয়। কারন তারা নিজেরাই জানে না সঠিক পথ কোন্‌টা। আমি ভিজিট ভিসা পেয়েই সামসু ভাইকে ফোন করলাম। সামসু ভাই এবং আমাদের ব্যাংকের আরও তিনজন এসেছিল তিন বছর আগে। এয়ারপোর্টে এসে বিমানে উঠার আগেই ফোন করলাম। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে আসছি। কারও গলগ্রহ হতে চাইনা। আমার জন্য একটা বাসা ভাড়া নেবার কথা আগে থেকেই ছিল এবং এয়ারপোর্ট থেকে আর একবার কনফার্ম করলাম। তিনি বললেন, সব ঠিক আছে। বাসা নেয়া হয়েছে। এসে দেখি কোন ব্যবস্থাই হয়নি। নিরুপায় হয়ে

হোসেনের বাসায় তিনদিন থাকতে হল। আমরা বাচ্চাসহ পাঁচজন। একজনের বাসায় কয়দিন থাকা যায়।

তাদের বাসার অবস্থা দেখে, তাদের কাজকর্ম চালচলন দেখে আমার ছেলেমেয়েরাও ভয় পেয়ে গেল। কেউ চাকরি করেনা, কাজ করে। দৈনিক বার ঘন্টা, চৌদ্দ ঘন্টা। দাঁড়িয়ে বা ছুটোছুটির উপর। এরা সবাই ভাল পজিশনে ছিল। এখানে একজন কাজ করে ফার্স্ট ফুডের দোকানে, একজন পিজার দোকানে, একজন কনস্ট্রাকশনে। বেতন যা পায় তা শুনে এবং কাজের নমুনা দেখে আমরা স্থির করলাম ফিরে যাব। আমার চাকরি তো আর ছেড়ে আসিনি, ছুটিতে এসেছি। চারদিন পরই একটা বাসা পাওয়া গেল। সাদেক আলী নামে এক বাঙালীর বাড়ী। সাদেক আলীর বাসায় গিয়ে উঠলাম। কিছুদিন পর সামসু ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি করা যায়? এভাবে কদ্দিন আর বসে বসে খাব।?

তিনি বললেন, অত তাড়াতাড়ি কি! এসেছ যখন, ঘুরে ঘুরে দেখ। আস্তে আস্তে নিজেই বুঝবে কি করা যায়। তবে টাই খুলে ফেল। টাই-এর কাজ এখানে মিলবেনা। এসব চলবেনা।

এসব শুনে ফিরে যাবার চিন্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর তোমার ভাবী ওটাকে থামিয়ে রাখে। আর কয়েকটা মাস দেখ। তারপর কিছু না হলে চলে যাও। যে কোন সময় যাওয়া যাবে। অত তাড়া কেন।

একদিন এক বাসায় বেড়াতে গিয়ে রবিবারের নিউইয়র্ক টাইমস উল্টাচ্ছিলাম। দেখি হাজার হাজার চাকরি। আমার মনে প্রশ্ন এল, এত সব চাকরি থাকতে আমার একটা চাকরি হবেনা কেন!

টেলিফোন নাম্বার নিয়ে পরদিন কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। কথাবার্তা বলার পর বুঝলাম চাকরি পাওয়া যাবে। কিন্তু কাজ করার অনুমতি এবং সোশাল সিকিউরিটি কার্ড লাগবে যা আমার নেই।

পরদিন আমাদের বাসায় দুজন মেহমান এল। তারা সাদেক আলীর মেহমান। নতুন এসেছি এবং আমার পদবীটা শুনে তারা মনে করেছিল তাদের দলের লোক। যেচে দেখা করতে এসেছে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তারা এসেই আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। কাজের খবরাখবর, কোন লোকের কাছে গেলে কি ধরনের কাজ মিলতে পারে, কে টাকা পয়সা দিয়ে প্রয়োজনে সাহায্য করবে সব খবরাখবর দিল। মনে হল তারা তাদের পেয়ারের মানুষকে এমনিভাইে সাহায্য করে আসছে। পরবর্তিতে দেখলাম আসলেও তাই। তারা একে অপরকে খুব সহযোগিতা করে এবং তাদের মাঝে একতা আছে। যখন বললাম, আমার চাকরি মিলবে যদি আমার একটা সোশাল সিকিউরিটি কার্ড থাকে। তখনই কলিমুল্লা তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, নিন এটা, আমার দুটো আছে। যতদিন ইচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

সোসিয়েল সিকিউরিটি কার্ড নিয়ে গেলাম একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে। ইন্টারভিউশেষে আমাকে অনেকগুলো ফরম দিল পূরণ করতে। ফরম পূরণ করতে গিয়ে পড়লাম বিপাকে। আমার নাম লিখতে পারবনা কোথায়ও। আবদুল হক না কি একটা নাম আছে কার্ডে। সে নামটা লিখতে হবে। আমার হাত তখন কাপছে। এতবড় মিথ্যা কি করে লিখি! কাপা হাতে ফরম পূরণ করে দিলাম। মহিলা বললেন, আগামি কাল সকাল আটটায় এই ঠিকানায় গিয়ে রিপোর্ট কর। বলে একটা কার্ড দিল। আরও বলল, তোমাকে ঘন্টায় আট ডলার দেয়া হবে।

ঘরে ফিরেই সামসু ভাইকে ফোন করলাম। সামসু ভাই, একটা চাকরি হয়েছে, কিন্ত ঝামেলা আছে। ভয় পাচ্ছি করব কিনা।

‘কি কাজ?

একাউন্টস পেয়েবল-ক্লার্ক।

ঝামেলাটা কি?

অন্যের কার্ডে তার নামে কাজ করতে হবে।

তাতে অসুবিধে কি? এরকম তো অনেকেই করে। তুমি মাত্র দরখাস্ত করেছ। কবে তোমার নিজের কার্ড পাবে তার ঠিক কি! এখন কাজ পেয়ে থাকলে শুরু করতে পার। এ ধরনের কাজ কেউ পেয়েছে বলে তো শুনিনি।

কেউ কোনদিন চেষ্টা করেছে? আপনি গেছেন কোথায়ও কোন কাজের জন্য? এসেই তো পিজা বানানো শুরু করেছেন। খবরের কাগজ পড়ে দেখেছেন কোনদিন? এখানে এসে যে কয়জন বাঙালির সাথে পরিচয় হয়েছে দেখলাম আপনিই সবচেয়ে সুখি। প্রতিদিন সকাল ছয়টায় বেরিয়ে যান কানে একটা ওয়াকম্যান লাগিয়ে আর ফেরেন রাত নয়টায়। আপনিই সবচেয়ে বেশি বেতন পান। ঘন্টায় পাঁচ ডলার। এত বেতন কেউ পায়না আপনাদের পরিচিত মহলে। আমার বেতন কত দেবে বলেছে শুনবেন?

কত দেবে বলেছে?

দশ ডলার ঘন্টায়।

ওপাশ থেকে সামসু ভাই একবারে চুপ হয়ে গেল। একটু পর বলল, আচ্ছা এখন রাখি। পরে কথা বলব।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে, তোমার ভাবীর সাথে পরামর্শ করে আমি সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। পরের দিন কাজে যোগদানের পর কি হবে ভাবতেই আমার কাঁপুনি এসে যায়। শেষ পর্যন্ত সকালে উঠে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমার আর একটা চাকরি হয়েছে, তাই যোগদান করতে পারলাম না। যোগদান করলামনা ঠিকই, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একটা ধারনা হল যে কাজ পাওয়া যাবে।

দুমাস পরেই আমি অস্থায়ী কাজের অনুমতি পেলাম এবং একটা সোশাল সিকিউরিটি কার্ড। পেয়েই দে ছুট একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে। কয়েক ঘন্টা পরীক্ষা নিয়ে চাকুরি একটা দিল নিউইয়র্ক সিটি ট্র্যানজিট অথরিটিতে। যদিও এটা সিটি জব, কিন্তু আমি সিটির কর্মচারি নই। আমি এজেন্সির কর্মচারি। এবার বেতন দিল এগার ডলার।

পরের দিন কাজে যোগ দিলাম। অফিস ছুটির পর তিনটা টাই কিনে সামসু ভাইর বাসায় গেলাম। তিনি এলেন রাত নয়টায়। চার ঘন্টা বসে রইলাম তার অপেক্ষায়। বললাম, আজ নিউইয়র্ক সিটি ট্র্যানজিট অথরিটিতে যোগ দিলাম এবং আরও তিনটে টাই কিনে নিয়ে এলাম। কারন এসব চাকুরিতে একটা মিনিমাম ড্রেস কোড রক্ষা করতে হয়। অফিসে আদেশ দেয়া আছে। সে মিনিমামটা হল টাই। সুট না থাকলে চলবে, কিন্তু টাই থাকতেই হবে। বেতন দেবে এগার ডলার।

এগার ডলার? তাহলে তো খুব ভাল চাকরি বাগিয়েছিস! কিভাবে কোথায় গেলি বলত! আমরা তো এদিকটা একবারও ভাবিনি!

তিন বছর পর গত সপ্তাহে সেই চাকরির মেয়াদ শেষ হল। সাদেক আলীকে বলেছিলাম কোন কাজের খোজ আছে কিনা। কলিমুল্লা শুনে নিজে থেকে নিয়ে এসেছে এখানে। কাজ আমার হয়ে যাবে যে কোন জায়গায়। তার জন্য কোন চিন্তা করিনা। এই জামাত ভাইর এখানে কাজ করবনা। চল এবার ফেরা যাক। ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও। পরে

কথা বলব। এ বাসায় খেতেও আমার ইচ্ছে করছে না। কিন্তু না খেয়ে ফেরত গেলে খারাপ দেখায়। তাই ভদ্রতা রক্ষা করব।

সৈয়দ সাহেবের ঘরে ফিরে তারা দেখে খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। অনেকে শেষ পর্যায়ে, মিষ্টি খেয়ে ছুন্নত আদায় করছেন। ভেতরে বাইরে পুরুষ মহিলা শিশু মিলে একটা হৈ চৈ লেগে আছে। যেন একটা মহা লগ্ন, অথবা বিশেষ অনুষ্ঠান। লম্বা টেবিলে খাবার সাজানো আছে, যার যার হাতে নিয়ে খাওয়া চলছে।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আনিসের চোখ চলে যায় মহিলা অন্দরে। সৈয়দ ভাবীকে চোখে পড়ছেনা। যাবার আগে তার সাথে দেখা করে যেতে বলেছেন। চাচার খাওয়া শেষ। কোন সময় তিনি রওয়ানা দেবেন কে জানে। এর মাঝে যদি দেখা না হয়! খাওয়া শেষ করে ভেতরে কয়েকবার উঁকি দিল আনিস। কোথায়ও দেখা গেলনা।

অর্ধেকের বেশি মেহমান চলে গেছে। বাহারও চলে গেছে। চাচা উঠি উঠি করছেন, এমন সময় ভাবীকে একটু দেখা গেল। আনিস তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বলল, ভাবী এখন আমরা যাব।

এখন তো কথা বলার সময় নেই। আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান। ফোনে কথা বলব।

পকেট হাতড়িয়ে আনিস এক টুকরো কাগজ পেলনা। বলল, ভাবী একটু কাগজ দিতে হবে। আমার পকেটে কোন কাগজ নেই।

এখন কাগজ আনব কোথা থেকে? কাছেই কয়েকটা প্যাকেট ছিল। মেহমানদের আনা উপহার। একটা প্যাকেট থেকে একটুকরো কাগজ ছিড়ে বলল, এই যে নিন।

আনিস তার ফোন নাম্বার লিখে দিয়ে বলল, এবার আসি।

আচ্ছা, আবার আসবেন। আমি ফোন করব সময় করে।

- ৯ -

ভ্যানে বসে চাচাকে আনিস জিজ্ঞেস করল, এ সব মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হল কি করে চাচা?

এখানে এসেই পরিচয়। প্রথমে আমি যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে কাজ করতাম সেখানেই সৈয়দ সাহেবকে আমি কাজ দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমাকে খুব সমীহ করে। সব কাজে আমার পরামর্শ নেয়।

মনে হয় এরা সবাই জামাতের লোক। আপনি এদের সাথে বেশি মিশবেন না।

বাবা আমি অত বুঝিনা। ছোটবেলায় নামাজ রোজা শিখেছি। এখনও যতটুকু পারি আদায় করতে চেষ্টা করি। সৈয়দ নামাজ রোজা করে। এর বেশি আমি কিছু বুজিনা। তারা কিসের লোক, কোন দলের তা কোনদিন জানতে চাইনি। তাছাড়া এত বছর বিদেশে থেকে দেশের হালচাল আমি কিছুই জানি না। রাজনীতির ব্যাপারও কিছু বুঝিনা। আমি আমার আমিত্ব বজায় রেখেই চলি, আমি জানি আমার ভাষা বাংলা, বাংলাদেশ আমার দেশ। তবে তুমি যখন খুশি নও আমি চেষ্টা করব তাদেরকে এড়িয়ে চলতে। কারণ আমি আমার ছেলেকে অখুশি দেখতে চাইনা।

রাতে শুয়ে শুয়ে সৈয়দ ভাবীর কথা ভাবছিল আনিস। নামটা জানা হলনা। তার গায়ের রং, মুখের গঠন - সব মিলে কোথায় যেন একটা চম্বুকের পিন্ড লুকিয়ে আছে। মানুষকে কাছে টানে - বার বার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। সিনেমার কোন্ কোন্ নায়িকাদের সাথে তুলনা করা যায়, চোখ কার মত, কার চুলের সাথে মিলে - সব নায়িকাদের কাছ

থেকে আহরিত সৌন্দর্য দিয়ে যেন সৈয়দ ভাবীর সৃষ্টি। অসাধারণ, অনন্যা। আনিসের ফোন নাম্বার নিয়েছে, কিন্তু আনিস সাহস করে তার নাম্বারটা আনতে পারেনি। সৈয়দ ভাবীর জন্য তার করুণা হয়। পঞ্চাশ বছরের একজন জামাতির স্ত্রী - একুশ বাইশ বছরের যুবতী! এ শুধু সম্ভব হয়েছে সৈয়দ সাহেব আমেরিকাবাসী বলে এবং তার টাকার জোরে।

পরের দিন রাতে আলমচাচা টি ভি দেখছে আর সিগারেট টানছে। করিম চাচা বাথরুমে। এখনি ঘুমিয়ে পড়ার সময় তাদের। ভোরে উঠতে হবে। তাদের হাটা চলা, খাওয়া পরা, কথাবার্তা সব যেন একটা ছক বাঁধা নিয়মে চলে। এদিক ওদিক হবার জো নেই। ভোর পাঁচটায় উঠে আলম চাচা, বাথরুমে যায়। বেরিয়ে এসে করিমকে ডাক দেয়। করিম বাথরুমে যায়, আলম নাস্তা তৈরি করে। এমনিভাবে পালা করে চলে তাদের সব কাজ। একদিন আলম চাচা, আর একদিন করিম চাচা। আনিসের পালা এখনও আসেনি মানে তাকে এখনও রুটিন দেয়া হয়নি।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এই ফোনটার জন্যই আনিস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সৈয়দ ভাবীর ফোন নিশ্চয়ই! আনিস তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো, আনিস আছে নাকি?

বলছি! আপনি ..ও বাহার ভাই?

হ্যা, কি করছ? তখন তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। ও এলাকটা ছেড়ে দাও। অন্যদিকে বাসা দেখ। ওটা খুব খারাপ জায়গা।

হ্যা, করিম চাচা বলেছে। দুবার গুলি খেয়ে, কয়েকবার মাগ্‌ড হয়েও তারা এখানেই থাকে। ঘরভাড়া সস্তা বলে।

সস্তার তিন অবস্থা জান তো?

হ্যা, জানি। একটা জায়গা ঠিক করতে হবে আগে। আপনার জানা থাকলে দেখুন কোথায়ও কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

আমি দেখব।

এখানকার মানুষগুলো দেখলে আমার ভাল লাগেনা। বাহার ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আপনি তো ব্যাংকে ছিলেন। এখানে আপনার প্রফেশনে কোন ব্যাংকে চাকুরি পেলেননা?

ওদিক থেকে বাহার হেসে উঠল। বলল, তুমি নতুন এসেছ। কিছুদিন গেলেই বুঝবে এখানে কারও অতীত প্রফেশন বলতে কিছু নেই। সব হারিয়ে যায়। একজন ব্যাংকার এখানে এসে লেবারের কাজ করে, কর্ণেল এসে বাসন মাজে, ডাক্তার এসে ট্যাক্সি চালায়। শিক্ষক গ্রোসারিতে কাজ করে, কলেজের ছেলেরা এসে ডেলিভারী দেয় ফার্স্ট ফুডের। এখানে টেকনিক্যাল কিছু না জানলে প্রফেশন নেই। টেকনিক্যাল জানা থাকলেও এদেশের একটা ডিগ্রী লাগে। আসল কথা হল তুমি কোথায় কার কাছে এসে প্রথম উঠলে, সেখানেই স্থির হবে তোমার প্রফেশন। যদি তুমি ট্যাক্সি চালকের বাসায় উঠ, তাহলে তুমি ট্যাক্সি চালক হবে, কনস্ট্রাকশনের কর্মির কাছে উঠলে, কনস্ট্রাকশনের কাজে নামবে, রেস্টুরেন্টের কর্মচারির বাসায় থাকলে রেস্টুরেন্ট কর্মচারি হবে। কারণ এখানে আসার পর পরই টাকার প্রয়োজন হয়। আর এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে হাতের কাছে যা পায় তাই শুরু করে। ভাবনা চিন্তার ফুরসুত নেই। একবার শুরু করলে আর ছাড়তে পারেনা মানে ছাড়া হয়ে উঠেনা। যার কাছে এসে প্রথম উঠে সেইই কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। এ থেকে সচরাচর অন্যথা হয়না। এখানে কেউ যদি অতীত প্রফেশন খোঁজে তাহলে না খেয়ে থাকতে হবে।

আমার তো কোন অতীত প্রফেশন নেই। আমার কি হবে?

এখানে তুমি যা তৈরি করবে সেই হবে তোমার প্রফেশন। এ দেশ তোমাদের মত যুবকদের জন্য, পরবর্তি প্রজন্মের জন্য, যারা তৈরি করবে নিজেদের প্রফেশন এ দেশের মত করে, এ দেশের প্রয়োজনে। আমার মত আরও যারা আছে তারা নতুন করে প্রফেশন তৈরি করতে যায় না সচারাচর। তুমি তৈরি করবে তোমার ভবিষ্যত। তোমার তো পিছুটান নেই। কাজেই তোমার চাচার কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে কাজ শুরু করে দিওনা কিন্তু। আগে জীবনটা তৈরী করে নাও। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটা কাজ করতে পার। নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী।

কনস্ট্রাকশন কোম্পানী আমার দেখা হয়ে গেছে। একদিন কাজ করে আমার অসুখ হয়ে গেছে।

এর মধ্যে কাজ করে ফেলেছ? বেশ তো!

না, কাজের উদ্দেশ্যে যাই নাই। দেখতে গিয়ে চাচাকে সাহায্য করেছি।

তা ভাল করেছ। আগামি শনিবারে তুমি চলে এস আমার বাসায়। জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে। ঠিকানাটা লিখে নাও। এফ ট্রেনে সোজা চলে আসবে ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ। উপরে উঠে ডানদিকে হাটলে দু ব্লক পরেই।

আচছা আসব।

-১০-

কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর কর্মচারিরা কাজে চলে গেছে সেই ভোরে। আনিস ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খেয়ে টেলিফোনটা পাশে রেখে বিছানায় শুয়ে রইল ভাবীর ফোনের অপেক্ষায়। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে আর অপেক্ষা করছে। এই বুঝি ফোন বেজে উঠল

নয়টা বাজল, দশটা বাজল, কৈ ভাবীর ফোন তো এলনা। সময় কাটেনা। করিম চাচার খাটের নীচে একটা পুরনো খবরের কাগজ পড়ে আছে। সময় কাটাবার জন্য ওটা তুলে নিল। নিউইয়র্ক টাইমস। তিন মাসের পুরনো কাগজ। করিম চাচারা কাগজ কেনেনা। এখানে এটা কিভাবে এসেছে কে জানে। উল্টিয়ে দেখে ভেতরের দিকের দুটো পাতা মাত্র। চোখ বুলিয়ে একটা খবরের উপর নজর পড়তেই সে থমকে গেল। সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। একবার, দুবার কয়েকবার পড়ল। সে কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! শরীরে চিমটি কেটে দেখল। নাহ্, ঘুমিয়ে নেই। এ কেমনতর দেশ! একজন ছিনতাইকারীকে ৪.২ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে! খবরটা এরূপ: জন ফ্রেজার ৪.২ মিলিয়ন ডলার পেলেন। জন মাগ (ছিনতাই) করে পলায়নের সময় পুলিশ ধাওয়া করে। ঝড়ের বেগে অনেকক্ষন ছুটেও জনকে কাবু করতে না পেরে পুলিশ তার পায়ে গুলি করে জখম করে এবং তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়। জন আদালতে তার গুলি খাওয়া পায়ের ক্ষতিপূরণ দাবী করে ৫ মিলিয়ন ডলার। বিজ্ঞ বিচারক তার দাবী সম্পুর্ন পূরণ না করে মাত্র ৪.২ মিলিয়ন আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।

খবরটা আনিসকে উত্তেজিত করে তুলল। একজন ছিনতাইকারী! তাকে গ্রেফতারের সব চেষ্টা করাই উচিত, এমন কি তাকে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে ফেলা উচিত। দুষ্কৃতিকারী সমাজ থেকে সম্পূর্ন উচ্ছেদ করা সব দেশের কর্তব্য। তা না করে তাকে ৪.২ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দিয়েছে! তাতে করে অন্যান্য ছিনতাইকারিকে উৎসাহিত করা হল! এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটা বেজে গেল। কিন্তু ভাবীর ফোন এলনা। মনে একটা চিন্ চিনে ব্যথা নিয়ে সে খাবার জোগাড় করল। করিম চাচা

বলে গেছেন। তরকারি আর ভাত ফ্রিজের ভেতর আছে। রান্না করতে তো পারবেনা, যা আছে তাই গরম করে খেয়ে নিও। বাসি ভাত আর ডিম ভাজা খেয়ে আনিস বেরিয়ে পড়ল ম্যানহাটানের উদ্দেশ্যে। আজ থার্টিফোর স্ট্রিটে নেমে যতটুকু পারা যায় ঘুরবে।

থার্টি ফোর স্ট্রিটে নেমে উপরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল আনিস। উত্তর দক্ষিন কোন দিকই সে ঠিক করতে পারেনা। নিউইয়র্কে নেমেই তার এ অবস্থা হয়েছে। দিক সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তার কাছে মনে হয় পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে। থার্টি ফোর স্ট্রিট আর সিক্সথ এভিনিউর উপর দাঁড়িয়ে ভাবছে কোনদিকে যাবে। উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরবে। অতএব দিক নির্দেশের প্রয়োজন নেই। রাস্তার দুপাশে আকাশচুম্বি অট্টালিকা। তার নীচে বিপনীকেন্দ্র। প্রতিটি দোকান যেন এক একটা বাসরঘর এমনি সাজিয়েছে। আয়নার ভেতর দিয়ে পন্যসম্ভার চোখে ধাধা লাগায়। দেখতে দেখতে আনিস এগিয়ে চলছে। সামনে রাস্তার কোনে লেখা আছে ফিফথ এভিনিউ। চাচী বলেছিলেন, ফিফথ এভিনিউটা ম্যানহাটানকে দু ভাগে ভাগ করেছে। একদিকে ইস্ট, আর এক দিকে ওয়েস্ট। এটা জানা থাকলে নাকি ঠিকানা খুঁজে পাওয়া একদম সোজা। রাস্তার কোণে তাকিয়ে দেখল আনিস। চাচীর কথাই ঠিক। ফিফথ এভিনিউর এদিকে লেখা আছে থার্টিফোর স্ট্রিট ওয়েস্ট, আর ওদিকে লেখা থার্টিফোর স্ট্রিট ইস্ট।

আনিস ফিফথ এভিনিউ ধরে দক্ষিণে উদ্দেশ্য বিহীন চলতে লাগল। প্রতিটি ফুটপাথ মানুষ গিজ গিজ করছে। কত দেশের কত রকম মানুষ। বিচিত্র চেহারা, নানাজাতের পোষাক। মানুষের কাফেলা। ছুটে চলছে তো চলছেই। কারও দিকে কেউ ফিরে তাকাবার সময় নেই। কেউ কেউ ছুটন্ত অবস্থাতেই খেয়ে নিচ্ছে। একটা মোটা রুটির মত, এটা নাকি পিজ্জা। এ খেয়েই লাঞ্চ শেষ। সবচেয়ে সস্তা খাবার। কম সময়। খাদ্যমানের ঘাটতি নেই। ছুটছে, খাচ্ছে। যেন পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে। ফুটপাথের পাশে এখানে সেখানে ফেরিওয়ালারা বসেছে তাদের পণ্য নিয়ে। যেন গুলিস্তানের ফুটপাথ। পৃথিবীর সব দেশের ফুটপাথই কি এক? নিজকে প্রশ্ন করে আনিস। ফুটপাথ আর পুলিশ। যেন একে অপরের সম্পুরক। এখানেও কি টাকা পয়সা দিয়ে ফুটপাথের দোকানিরা তাদের ব্যবসা হালাল করে নেয়? এমনি ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল আনিস।

অনেক ফেরিওয়ালার মাঝে একজনের চেহারা দেখে মনে হল যেন কত পরিচিত। নিজের মানুষের একজন। এত মানুষের মাঝে নিজের মানুষ কি করে চেনা যায় সে নিজেই জানেনা। অথচ লোকটাকে দেখে মনে হল তার অনেক চেনা। একটা চাদর বিছিয়ে তার উপর সস্তা ঘড়ি, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি করছে। এক ডলার বা দু ডলার দাম। ক্রেতার অভাব নেই। কেউ শুধু হাতড়ায়, দেখে চলে যায়। কেউ কেনে। আনিস দাঁড়িয়ে ভাবছে তাকে জিজ্ঞেস করবে কিনা। যদি বাংলাদেশী না হয়! অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল, আর ইউ বাংলাদেশী? লোকটা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বাংলায় বলল, হ্যা, বাংলাদেশী।

কেমন চলে আপনার ব্যবসা?

ভালই চলছে।

এই যে ফুটপাথে যারা দোকান নিয়ে বসেছে তাদের পুলিশ দাবড়ায়না? এ দেশের পুলিশ নিশ্চয়ই ভাল বলতে হবে।

দাবড়ায়না মানে? এইযে চাদরটা দেখছেন এটাইতো প্রমান।

চাদরটা কি প্রমাণ?

মানে পুলিশ আসলে আগেই খবর হয়ে যায়। আর খবর পাবার সাথে সাথে চাদরের চার কোণে ধরে গাট্টি বেধে কোথায়ও অপেক্ষা করি। চলে গেলে আবার বসি। এমনিভাবে খেলতে খেলতে ব্যবসা করি।

বাংলাদেশের মত করা যায়না? পুলিশের পকেটে কিছু দিয়ে দিলে হয়না?

না, এ দেশের পুলিশ এখনও এটা শুরু করেনি। তবে চেষ্টা চলছে।

পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কি করে?

জরিমানা করে। সাথে সাথে জরিমানা আদায় করলে পাকা রিসিট দেয়। পয়সা মারার কোন ফাঁক রাখেনা। আনাদায়ে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়। তখন হয় মহা ঝামেলা। কাগজ না থাকলে তো মহা বিপদও হতে পারে। তবে যাদের ভেন্ডার লাইসেন্স আছে তাদের কোন অসুবিধে নেই।

কি রকম থাকে ডেইলি?

পঞ্চাশ, ষাট কোন কোনদিন এক শ ও থাকে। এ ব্যবসা শুধু সামারেই চলে। উইন্টারে চলেনা। তখন বসে থাকতে হয়।

অন্য কাজ করেন না কেন যেখানে সারা বছর কাজ করতে পারেন।

আমার একটু কাগজের অসুবিধে আছে, যার জন্য কেউ কাজ দেয়না।

তবুও ভাল একটা কিছু করছেন। আচ্ছা চলি। আবার হয়ত দেখা হবে।

ফোরটিন স্ট্রিটের কোণে এসে আনিসের তাক লেগে গেল। গান্ধীজির মূর্তি! এখানে! এ দেশের মানুষ গান্ধীজিকে কতটুকু জানে! নিশ্চয়ই এদেশের মানুষের কাছে তাঁর স্থান অনেক উর্ধ্বে। না হয় তাঁর মূর্তি তৈরি হবে কেন? আনন্দে গর্বে তার বুকটা ভরে গেল। মনে হল মহাত্মা গান্ধীজি তার নিজের একজন। মহানগরীতে মহাপুরুষের মহান অর্ঘ্য। ভারতবাসী সকলেই তাঁর গর্বে গর্বিত।

চোখে ধাঁধাঁ লাগানো অগণিত বিপনী দেখতে দেখতে আনিস আনমনা হয়ে যায়। যতই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ততই মানুষের কাফেলা বাড়ছে। রং এবং চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে। এদিকে ভবঘুরের সংখ্যা বেশি। জোড়ায় জোড়ায় স্বল্পপোষাক পরিহিত স্ত্রীপুরুষ ধীর মন্থর গতিতে চলছে। যেন তাদের কোন তাড়া নেই, কাজ নেই, কোন পিছুটান নেই। কোথাও জোড়া বেঁধে বসে আছে। তারা যেন গতিহারা। দালান কোঠা বাড়ী ঘর দেখে মনে হয় বহুকালের জীর্ণ, উপেক্ষিত। ঠিক যেন ঢাকার পুরাতন শহর। এখানকার মানুষগুলোও যেন তেমনি উপেক্ষিত।

আরও একটু এগিয়ে দেখে মানুষের চেহারা বদলাচ্ছে, চঞ্চলতা বাড়ছে। এদিকটা প্রায় সব দোকানদার চাইনিজ বা কোরিয়ান চেহারার। তারা অতি ব্যস্ত। ফুটপাথ মানুষে গিজ গিজ করছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কেনা বেচায় সবাই ব্যস্ত। এ যেন এক অন্য জগত। এলাহি কান্ড। বিচিত্র ব্যবসা। বিচিত্র ক্রেতা। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে আনিস।

কোণে দাঁড়িয়ে ভাবছে এবার কোন দিকে যাবে। হঠাৎ তার চোখ গেল রাস্তার অপর দিকে। একটা লোকের দিকে, হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। দেখতে অবিকল আমানের মত। মনে হয় দৌড়ুচ্ছে। আমান এখানে আসবে কোত্থেকে! কলেজ ছাড়ার পর তো তার সাথে আর দেখা নেই। মফস্বলে মাস্টারি নিয়ে চলে গেল। বোধ হয় ভালই আছে। না হয় ঢাকায় এলে অন্তত তার সাথে দেখা করত। একে অপরকে দুদিন না দেখলে ছট ফট করত। এখন রাস্তায় "ডোন্ট ওয়াক" জ্বলছে। করিম চাচা বলেছে, রাস্তা পার হবার সময় খুব সাবধানে পার হবা। ওয়াক

হলেই রাস্তায় নেমে যাবানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করবা। কিছু ক্রেজি ড্রাইভার আছে। লাল মাইরা, মানুষ মাইরা দরকার হলে পুলিশ মাইরা চইলা যায়। মারার পর কি বিচার হইব সেটা পরের কথা। তাই ওয়াক হবার পরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আনিস রাস্তা পার হচ্ছে। লোকটাও এদিকেই আসছে। সামনাসামনি হতেই দুজনে থমকে গেল। আরে তুই! এখানে! দুজন দুজনকে একই প্রশ্ন করছে।

এদিকে আয়, বলে আমান আনিসের হাত ধরে রাস্তার কোনে গিয়ে দাঁড়াল। এক হাতে একটা কাগজের বড় প্যাকেট। বলল, জ্বলদি লেখ, আমার ফোন নাম্বারটা। তোর নাম্বারটাও দে। দাঁড়াবার সময় নেই। রাতে কল করিস, না হয় আমি করব, বলে আমান হন হন করে চলে গেল।

আমানের গমন পথের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল আনিস। সে কিছুই বুঝতে পারছেনা। এতদিনের বন্ধুত্ব, এতদিন পরে দেখা! একটু কথা বলার সময় নেই তার! কবে এল এদেশে। হয়ত অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে। তাই সময় নেই। বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই মানুষ বদলে যায়। পুরাতন খোলস ঝেড়ে ফেলে নতুন খোলসে নিজকে সাজায়। এই বিদেশে সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু, যাকে পেয়ে আমার মন খুশিতে নেচে উঠল, সেই কিনা এক দন্ড সময় দিতে পারলনা! নিজে থেকে তাকে কল করবেনা বলে আনিস সিদ্ধান্ত নিল।

আজকের দিনটা একদম মাটি হয়ে গেল। না ভাবী ফোন করল, না বন্ধু কথা বলল। বামদিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল কিছু সবজির দোকান। মনে হল পুঁই শাকের মত কি একটা। এগিয়ে গিয়ে সে আরও অবাক হল। সত্যি পুঁই শাক। এখানে পুঁই শাক! তার পাশে ডাটা শাক! আরও এগিয়ে গিয়ে তার মনে হল সে ঢাকার ঠাটারি বাজারে আছে। মাছ থেকে সব রকমের সব্জি। অনেকক্ষন ঘুরে, এ দোকান সে দোকান করে বাসায় ফিরল অনেক দেরীতে।

-১১-

অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকেই করিমচাচার সামনে পড়ে যায় আনিস। রান্নাবান্না শেষ করে তারা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আনিস বুঝতে পারল আজ তার অনেক দেরী হয়ে গেছে। করিম চাচা বলল, কাপড় বদলে এস খাই। খাওয়া রেডি। আজকে কোথায় কোথায় গেলে?

'বেশি দূর নয়। থার্টি ফোর স্ট্রিট থেকে ফিফথ এভিনিউ ধরে ডাউনের দিকে। একটা জায়গায় গেলাম। মনে হল ঢাকার ঠাটারী বাজার। বাংলাদেশের অনেক তরকারি দেখলাম।

ও, তাহলে তুমি চায়না টাউনে গেছিলে। চাইনীজরা তো আমাদের কাছাকাছি খাবার খায়। ওখানে প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। করিম চাচা বলল।

তার আগে একটা জায়গায় পুরোনো বাড়ীঘর দেখলাম। ওগুলো তো ঢাকার চকবাজার মোগলটুলির মত।

তুমি ভিলেজের কথা বলছ। নিউইয়র্কের ভিলেজ এই শহরের প্রাণ বলতে পার। যত ভিজিটর আসে সকলেই আগে ভিলেজ দর্শন করে। না হয় তাদের ভ্রমন পূর্ণ হয়না। তুমি তো এর ভেতর যাওনি। গেলে দেখবে শতবর্ষের জীর্ন পুরাতন দালানকুঠা প্রায় ধ্বসে পড়ছে। মেরামত করে কোনরকমে টিকিয়ে রাখছে। কিন্তু ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করছেনা।

মনে হয় তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখছে। ওই জীর্ণতাই যেন শহরের প্রাণ। ওখানে গেলে একদিনে দেখে শেষ করতে পারবেনা।

এক বন্ধুর সাথে দেখা। সে কথা বললনা। তার সময় নেই। অথচ আমরা চার বছর এক সাথে পড়াশুনা করেছি। আমরা ছিলাম হরিহর আত্মা। তারই কিনা সময় নেই!

ওসব নিয়ে মন খারাপ করোনা। জীবনে অনেক বন্ধু আসবে, যাবে। ধরে রাখার মত, প্রানের মধ্যে নিজের আসন করে নেবার মত খুব কমই পাবে। হয়ত বা সে সত্যিই ব্যস্ত ছিল। বাদ দাও সে কথা। এস খাই।

খেতে বসে আনিস তার মনের দুঃখ ভুলে গেল। একটা নতুন জিনিষ দেখে। কদু। যেন বাংলার গন্ধ, বাংলার স্বাদ। খুবই সুস্বাদু হয়েছে। বলল, কে রান্না করেছে চাচা?

আমি করেছি, ভাল হয়নি বুঝি, আলম বলল।

আনিস বলল, এই প্রথম মনে হল বাংলাদেশে বসে খাচ্ছি। এর গন্ধ, স্বাদ সবই তো বাংলাদেশের মত। খুব স্বাদ হয়েছে। তাহলে বাংলাদেশের স্বাদ এখানে পাওয়া যায়?

হ্যা, কোন কোন সব্জি আছে, যা বাংলাদেশের মতই। যেমন, লাউ, আলু, ঢ্যাড়স, আলু-কচু, শশা, ইত্যাদি। আরও কিছু যদি পেতে চাও তবে চায়না টাউনে চলে যাও। ওখানে অনেক কিছুই পাবে। ওদের খাবার আমাদের খুব কাছাকাছি। শুধু মশলাটা ওরা খায়না। আর সবই প্রায় এক। তাছাড়া বাঙালী গ্রোসারীতেও অনেক কিছু পাওয়া যায়।

বাঙালি গ্রোসারী কতগুলো আছে?

কয়েক ডজন। এক ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতেই তো ডজন খানেকের কাছাকাছি। সব গ্রোসারিতেই হালাল খাবার পাওয়া যায়। ওখানে গেলে মনে হয়না আমরা আমেরিকায় আছি। নিউইয়র্কের প্রায় সব এলাকাতেই বাঙালি গ্রোসারী আছে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। করিম চাচার পাশেই ছিল বলে তিনি রিসিভার উঠিয়ে বললেন, হ্যালো। ওপাশ থেকে কে কি বলল বুঝা গেলনা। জি, আছে, বলে শুধু রিসিভারটা আনিসের দিকে এগিয়ে দিলেন।

হ্যালো, কে? আমান? ও তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষন চাচার সাথে। তোর কথা বলার সময় ছিলনা। তুই এমন কি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলি যে দু মিনিট সময় হয়নি কথা বলার? মনে মনে রাগ করে আছি। ভাবছিলাম তুই কল না করলে আমি করবনা।

তা তো ভাববেই। নতুন এসেছ তো! তাই এখনও টের পাওনি কত ধানে কত চাল। এখনও তো ডেলিভারীর কাজ করনি! তাহলে টের পেতে কথা বলার কত সময় পাওয়া যায়। এক মিনিট কথা বলার দাম কত। এটাকে আবার চল্লিশ দিয়ে গুণ কর। তারপর বুঝবি সময়ের দাম কত। এখন তোর সাথে সারা রাত কথা বলতে পারব। আমার তাড়া নেই।

তাহলে একটু ধর, আমি হাতটা ধুয়ে আসি। তোর সাথে আজ সারারাত ঝগড়া করব।

ফিরে এসে আনিস জিজ্ঞেস করল, তুই বলছিলি ডেলিভারী। কি ডেলিভারী করিস যে সব ধানের সব চাল তোর গোনা হয়ে গেছে?

তার আগে তুই বল, কবে কি ভিসায় এলি?

এই তো কয়েকদিন হল। এসেছি ওপি ভিসায়।

তুই ভাগ্যবান।

তোর মনে আছে আমার চাচার কথা বলতাম? কোথায় আছে কিছুই জানতামনা। কিন্তু আমাদের ভরণপোষনের টাকা ঠিকই পৌঁছত? সেই

চাচা এখানে বিয়ে করে সিটিজেন হয়েছেন। চাচীই দরখাস্তের ফরমটা পাঠিয়েছিলেন। সব খরচপত্র তিনিই দিচ্ছেন। তুই কবে এলি? তুই না কসবায় মাষ্টারী করতি?

আমার কাহিনী তো অনেক। একদিনে শেষ হবেনা। সংক্ষেপে শুধু এই যে, বিয়ে করে দুটি সন্তানের ভরণপোষনের কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। মাষ্টারীর বেতন দুএক মাস পর পর যা পেতাম তা দিয়ে সপ্তাহ তিনেক চলত। সংসার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে যখন ডুবে যাচ্ছিলাম তখন আমার এক ভায়রাভাই আদম বেপারির সাথে দেখা। অনেক টাকার মালিক। নিজের ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে। বিদেশে আদম পাঠিয়ে না পাঠিয়ে টাকার পাহাড় বানিয়েছে। সেই আদম বেপারির সাহায্যে গ্রামের সম্পত্তি বিক্রি করে তাকে দু লাখ টাকা দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় নিলাম। দরখাস্ত করার পর একটা অস্থায়ী ওয়ার্ক পারমিট পেলাম এবং সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার। এ দিয়ে যে কোন জায়গায় কাজ পেতে কোন অসুবিধে হয়না। কিন্তু আমি কি কাজ জানি? এদেশে শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে হয়ত শিক্ষকতা মিলবে। এখানে কোর্স করতে হবে, সার্টিফিকেট নিতে হবে। তারপর যদি মেলে তবে পয়সা ভাল। ঘন্টায় বিশ পঁচিশ ডলার। এখানে এসেছি প্রায় চার বছর। অন্য কোন কাজ না পেয়ে পিজা ডেলিভারি করি। যতক্ষন ডেলিভারী করি ততক্ষন দৌড়ের উপর থাকতে হয়। সব সময় ডেলিভারী হয়না। লাঞ্চ এবং ডিনারের সময়ই ডেলিভারী হয়। তাই এই সময়টা ঠিকভাবে কাজে লাগাই। তোর সাথে যে কোন সময় কথা বলা যাবে কিন্তু ডেলিভারী ছুটে গেলে ডলার ছুটে যাবে। এখন বল কি বলবি।

পিজা ডেলিভারী দিয়ে তোর চলে?

তা এক রকম চলে যায়। পয়সা ভালই আসে। অন্যান্য অড জবের চেয়ে ভাল। যে কোন অড জব কম পক্ষে আট ঘন্টা দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। আর অড জব ছাড়া তো কোন উপায়ও নেই। ডেলিভারীতে একটা সুবিধে এই যতক্ষন ডেলিভারী ততক্ষনই ব্যস্ত। তারপর ফ্রি। এটা নিজের ব্যাপার। কোন বস্ নেই। নিজের বস্ নিজে। সকাল বিকেল ফ্রি আছি বলে শিক্ষকের কোর্সটা শেষ করছি। আচ্ছা, তুই উঠেছিস কোথায়? তোর চাচার বাসা কোথায়?

আমি চাচার বাসায় উঠিনি। উঠেছি একটা মেসে।

কোথায় সেটা?

নস্ট্রেন্ড এভিনিউ।

নস্ট্রেন্ড এভিনিউ! ওখানে মানুষ থাকে নাকি! সব মাগারে ভর্তি। আর জায়গা পেলিনা? চাচার বাসায় না উঠে মেসে উঠতে গেলি কেন?

চাচা চাচীই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। উনারা চান আমার সুবিধে মত নিজের ভাবে থাকি।

তাহলে তুই চলে আয় আমার সাথে। আমি একা একটা রুমে থাকি। একজন পার্টনার খুঁজছি। ভালই হল তুই এসেছিস। দুজনে এক সাথে খুব মজা করে কাটবে। আমরা আবার আগের দিনে ফিরে যাব।

এ জায়গাটার কথা সবাই খারাপ বলে। আমারও ইচ্ছে অন্য কোন ভাল জায়গায় চলে যাই। তুই কোথায় থাকিস?

ব্রুকলিন, ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ

আরে বাহার ভাইও তো ওখানে থাকেন। তুই বাহার ভাইকে চিনিস? একজন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা। এখানে এসে চুপসে গেছে। তিনিওতো

বললেন এই জায়গাটা ছেড়ে দিতে। আগামী রোববারে বাহার ভাইর বাসায় যাব। তোর কাছাকাছিই হবে হয়ত। তুই চলে আয় রোববারে।

ঠিকানা কি?

ঠিকানা বলার পর আমান বলল, আরে, এ তো আমাদের বাসা থেকে দু ব্লক মাত্র।

তাহলে তো খুবই মজা হবে। তোর এখানেই আমি চলে আসব। চাচাকে কালই বলব।

বাহার ভাই কি পরিবার নিয়ে থাকেন?

হ্যা, পরিবার নিয়েই এসেছিলেন। তোর বউ বাচ্চার খবর কি? কেমন আছে?

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা অস্পষ্ট ভগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল -- আমা...র ! তারপর অনেকক্ষন কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। টেলিফোন বিভ্রাট মনে করে আনিস হ্যালো হ্যালো বলে যাচ্ছে। এক সময় আমানের কান্নাজড়িত কণ্ঠ ভেসে এল। আমি গ্যাড়াকলে আটকে গেছিরে আনিস! আনতেও পারিনা, যেতেও পারিনা! রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছি এই বলে যে, দেশে গেলে আমার নিরাপত্তা নেই। তাই দেশে যাবার কথা বলতে পারিনা। বিশেষ কারণ দেখিয়ে গেলে মামলা দুর্বল হয়ে যাবে। একটা বাচ্চাকে দেখে এসেছি দু'বছরের, তখন আধো আধো ভাংগা শব্দ থেকে পূর্ন শব্দে পৌছেছে। তার প্রতিটি শব্দ, কখন, কিভাবে বলেছিল সেসব এখন মধুর হাহাকার হয়ে আমার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যখন তখন আমি শুনতে পাই। আমি দিশেহারা হয়ে আনমনা হয়ে যাই। হঠাৎ কোথায়ও থমকে যাই। ডেলিভারীর প্যাকেটটা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। আবার যখন মনে করি দেশে ফিরে গেলে শুধু স্নেহ আদর দিয়ে তো সন্তান মানুষ করা যাবেনা, দারিদ্রের কাছে আদর স্নেহ, ভালবাসা সব তুচ্ছ, তখন আবার চলতে থাকি। টাকা পাঠাতে হবে, সন্তান মানুষ করতে হবে। আর ছোটটা, এতদিনে হয়ত পূর্ন বাক্য দিয়ে, তার মাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করছে। যে পিতা সন্তানের আধো আধো ভাঙা শব্দ শুনতে পায়না, কোমল হস্ত কণ্ঠ জড়ায়না, মুখের লালায় যার বক্ষ ভিজে না, সে পিতার জীবন ব্যর্থ! আমি সেই ব্যর্থ পিতা! ওদের কথা মনে হলে আমি দিশেহারা হয়ে যাই।

আমি দুঃখিত আমান। না জেনে তোর মনের দুঃখটা জাগিয়ে তুলেছি। আচ্ছা তোর ঠিকানাটা বল, আমি আগামী রবিবারে তোর সাথে দেখা করব। না হয় এক কাজ করনা, তুই চলে আয় বাহার ভাইর বাসায়। ঠিকানাটা লিখে নে। আজ আর তোর সাথে কথা বলবনা। তুই সুস্থ নেই। পরশু শনিবার বাহার ভাইর বাসায় দেখা হবে।

- ১২ -

আজ শনিবার। বেলা দশটার দিকে এসে পৌছল বাহারের বাসায়। নির্দেশনা অনুযায়ী এসে পৌছতে কোন অসুবিধে হয়নি। বেল টিপতে হয়নি। দরজা খোলা। দোতলার বাম দিকে থাকেন। আনিসকে দেখেই বলল, চিনতে অসুবিধা হয়নি তো? আস, নাস্তার টেবিলে যাবার আগে পরিচয় করিয়ে দেই। সোফাতে দুজন অতিথি বসে আছে। বাহার পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি আবদুল লতিফ, হালে ট্যাক্সি চালায়। নিউইয়র্ক শহরে নব্বই ভাগ ট্যাক্সি চালক বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানী। যথেষ্ট রোজগার করে। দৈনিক এক দেড়শ ডলার। পরিশ্রমও যথেষ্ট। তবে একটা সুবিধা এই যে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া

যায়। কারন ইনকামের কোন প্রমান নেই। ট্যাক্সি চালকরা দয়া করে সরকারকে যা ইনকামের কথা বলবেন তাই ঠিক। যার যত বেশি ইনকাম তার তত বেশি ট্যাক্স দিতে হয়। কাজেই চালকরা একটা হিসাব করেই ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে। এই ট্যাক্সি ব্যবসাটা শুরু করা সহজ। ট্যাক্সি চালানোর লাইসেন্স নিয়ে গাড়ী ভাড়া করে শুরু করে দেয়া। রাস্তা ঘাট ভাল করে চিনতে হবে। রাস্তাঘাট সম্বন্ধে যাদের ভাল ধারনা তারা বেশি রোজগার করে। এসব চালকদের কর্মজীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। একদিন তোমাকে লতিফের চালক জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবো।

আর ইনি হলেন ফখরুল। বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি। এসোসিয়েশন যারা করে তাদের একটা স্থায়ী ইনকামের ব্যবস্থা থাকে। ফখরুলের কয়েকটা কেন্ডি ষ্টোর আছে। তার থেকে যা ইনকাম হয় তা দিয়ে সংসার খরচের পরও যথেষ্ট সঞ্চয় থাকে। কোন কাজ না করলেও চলে।

আনিস বলল, শুনলাম এখানে কয়েক শ' সংগঠন আছে। এতসব এসোসিয়েশন আর সমিতির এখানে করার কি আছে? একটা এসোসিয়েশন থাকলেই বোধ হয় যথেষ্ট।

একদিক থেকে একথা ঠিক। ফখরুল বলল। কিছু কর্মকান্ড আছে যা একটা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সঠিকভাবে করা হয়ে উঠে না। অনেকের ইচ্ছা পূরন হয় না। প্রবাসীর প্রয়োজনেই নতুন নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বাঙালি সংগঠনপ্রিয়। যেখানেই যায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই মাথায় চিন্তা আসে একটা সংগঠনের কথা। সংগঠন হয়। ভাঙ্গে। জোড়া লাগে না। ক্ষমতা ভাগ হয়। পৃথিবীর আর কোন মানুষের মাঝে এত সংগঠন নেই। সংগঠন করতে গিয়ে দলের সৃষ্টি হয়। একটা রাজনৈতিক ধারা চলে আসে। তারা ভুলে যায় তারা অন্য দেশে অন্য পরিবেশে আছে। কাজকর্মে কথাবার্তায় চলে আসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সমর্থন। পরিষ্কার হয়ে উঠে রাজনৈতিক দলের নাম ও কথাবার্তা। যদিও এখানে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কিছুই করার নেই। তারপরও বাঙালিরা সংগঠন করে। এখন ব্যাঙের ছাতার মত সংগঠন গজে উঠেছে। বর্তমানে আড়াইশ'র উপর বাংলাদেশী বাঙালিদের সংগঠন আছে।

আনিস জিজ্ঞেস করল, এত সব সংগঠনের প্রয়োজনটা কি?

সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা যে নেই তা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। ঘরকুণো যে বাঙালী ক্ষেতের আল, বিলের ধারে আর বড়জোর বাজারে সীমাবদ্ধ ছিল, হঠাৎ করে সহস্র মাইল দূরে, ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে নিপতিত হয়ে কি হারানোর বেদনা অনুভব করে। ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবন ধারা, ভিন্ন জীবিকা, বৈরি পরিবেশে ভিন্নতর স্বাদের মাঝে খুঁজে বেড়ায় আপন সংস্কৃতির গন্ধ। বাসনা জাগে নিজেদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে ধরে রাখার। আর তা সম্ভব শুধু সংগঠনের মাধ্যমে। ক্রিয়াকর্মের ভিতর দিয়ে, যোগাযোগের মাধ্যমে, উৎসবের মাধ্যমে, আনন্দ বেদনা প্রকাশের মাধ্যমে। একক ভাবে এই কাজ সম্ভব নয়। তাই নতুন নতুন সংগঠনের জন্ম হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনে। সংগঠন শুরুর গোড়ার দিকে ফিরে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। সংক্ষেপে একটু ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ সোসাইটির উৎপত্তি সম্মন্ধে যেটুকু আমার জানা আছে তা হল,এখানে পাকিস্তান ষ্টুডেন্ট লীগ অব আমেরিকা নামে একটা সংগঠন ছিল, পরে ইষ্ট পাকিস্তান ষ্টুডেন্ট লীগ নামে সংগঠিত হয়। এই সংগঠনে

বেশ কিছু সদস্য ছিল যারা ছাত্র নন। তাই এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলনের দাবানল জ্বলে উঠলে ১৯৭১এর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা। এই লীগ অব আমেরিকা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখার গৌরব অর্জন করে। এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ড: খন্দকার আলমগীরের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এর বিপরীতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন জন্ম নেয়। স্বাধীনতা বিরোধীরা এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় সংগঠিত হবার প্রয়াস পায়। অনেক নতুন অভিবাসী না জেনে এই সংগঠনে যোগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেক সচেতন ব্যক্তি এই সংগঠনের সদস্য হয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই সংগঠনের কর্মকর্তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাদের কর্মকান্ড নবাগতের বিমুখ করে তোলে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই সংগঠন নিক্রিয় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা'তে যে গতির সঞ্চার হয়েছিল স্বাধীনতার পর তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। এ সময় বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কিছু তরুন নিউইয়র্কে আসতে থাকে। এদের প্রায় সকলেই পেশাজীবি, উচ্চশিক্ষিত যুবক। তাদের মধ্যে সিংহভাগ ছিল ফার্মাসিষ্ট, ডেন্টিষ্ট এবং তাদের সাথে বেশ কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। তাদের রক্তে তখনও মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই নবাগতরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরও গতিশীল,কর্মমুখর দেখতে চায়, স্বাধীন বাংলাদেশের কর্মকান্ডের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে চায়। পুরনো সংগঠন কোনটাই এই নবাগতদের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া এই সংগঠন দুটোর কাজের ধারা হয়ে পড়েছিল গতানুগতিক ও প্রথাভিত্তিক। নবাগতরা চায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আরও প্রসার হোক, রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সুদূর প্রবাসেও তার প্রতিফলন ঘটুক। উক্ত সংগঠন দুটোর কাজ কর্মে তারা হতাশ। এই হতাশ সদস্যদের পরিকল্পনাতে জন্ম নিল 'বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক'। ১৯৭৫ সালের ২৩শে নভেম্বর চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সোসাইটির যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্য হল, (১) প্রবাসী বাঙালিকে একই সূত্রে গ্রথিত করবে এবং তাদের সমস্যায় সর্ববিধ সাহায্য করবে (২) প্রবাসে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও চৈতন্য অক্ষুন্ন রাখবে (৩) বাঙালি ও বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে সহয়তা করবে (৪) এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ঘটনাবলী আরও সম্পুর্নভাবে আমাদের অবহিত করবে এবং প্রবাসে আমাদের মতামতের বাহন হিসেবে কাজ করবে।

তার আগে ১৯৭১ সালের নভেম্বরে দুই বাংলার অভিবাসীকে নিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে "বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ" নামে একটি ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ অব্যবসায়ী স্বেচ্ছা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। উদ্দেশ্য এই সংগঠন দুই বাংলার বাঙালীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। সেই সাথে এর মুখোপত্র হিসেবে 'সংবাদ বিচিত্রা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা আরম্ভ করে। বাংলাদেশের খবর জানার একমাত্র বাংলা পত্রিকা ছিল এই সংবাদ বিচিত্রা। এখনও নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। এই সঙ্ঘের পরবর্তি প্রয়াস বাংলা স্কুল স্থাপন করা। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে পেলহ্যাম ম্যানরে, ম্যানহাটনে, কুইনস ও

ব্রুকলীনে কয়েকটি বাংলা পাঠশালা চালু করে। বাংলা শিক্ষার সাথে সাথে বাংলা নাচ গানও অনুশীলন করা হত।

১৯৮১ সালে সঙ্ঘের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল বঙ্গ সম্মেলন স্থাপন। বঙ্গ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল বছরে একবার বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালী সংস্থাগুলোকে একটি মঞ্চে আনা, মনন ও সংস্কৃতি বিনিময় করা, প্রবাস জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন তুলে ধরা। নতুন প্রজন্মকে বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, নিজেদের মধ্যে পরিচয় এবং যোগাযোগ স্থাপন করা। এই সম্মেলনে দুই বাংলার কবি সাহিত্যিক শিল্পী, বুদ্ধিজীবি এবং সাংস্কৃতিক দল আসেন। নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাঙালী সংগঠনের পৃষ্টপোষকতায় অনষ্ঠিত হয় বঙ্গ সম্মেলন।

যদিও এই সংগঠন দুই বাংলার বাঙালীদের উদ্দেশ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশী সদস্য খুব একটা ছিল না। পরবর্তিতে দেখা গেল এই সংগঠন পশ্চিম বাংলার প্রবাসী দ্বারাই পরিচালিত। বাংলাদেশী সদস্য একমাত্র ড: খন্দকার আলমগীর ছাড়া আর কেউ জড়িত ছিল বলে জানা যায়নি। কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী সম্মেলনে যোগদান করেন শুধু ড: আলমগীরের চেষ্টাতেই। এর অনেকগুলো কারণও আছে। পশ্চিম বাংলার মানুষ আর পূর্ববাংলার মানুষের মাঝে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য পর্দা কাজ করে। সভা সমিতি বা শিল্পি সাহিত্যিক নির্বাচনে বাংলাদেশের গুরুত্ব পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে তেমন একটা পায় না। বাংলাদেশী সংগঠন বা ব্যক্তির কাজকর্ম সম্মন্ধে পশ্চিম বাংলার মানুষের কোন আগ্রহ নেই। তাদের মূল্যায়ন করাটাও প্রয়োজন মনে করে না। তাই তারা এখনও জানেন না এই নিউইয়র্কে কয়টা বাংলা কাগজ বের হয় এবং বাংলাদেশী কৃতি সন্তান বাঙালি কত জন, কোথায় কি করেন। কোন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের সব সময় নিমন্ত্রণ বা জানানো হয় না। বিশেষ করে দেশ থেকে শিল্পী সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক দল নির্বাচন থেকে প্রতিয়মান হয় যে এই সঙ্ঘ বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিককে তেমন গুরুত্ব দেন না। তাই বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ পশ্চিম বাংলায়ই রয়ে গেছে। পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করতে পারেনি। যদিও বাঙালি প্রবাসীর শত করা ৯৬ ভাগ বাংলাদেশি। এবং প্রতি বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশিদের প্রয়োজনে ১৯৮৬ শুরু হয় বাংলাদেশ সম্মেলন। সম্মেলন করার জন্য একটি সম্মিলিত বাংলাদেশ সংগঠন গঠন করা হয় যার নাম ফোবানা মানে ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা। এর উদ্দেশ্য প্রবাসী বাংলাদেশীরা বছরে একবার মিলিত হবে কোন একটা শহরে। এর তদারকির জন্য কিছু সংগঠন দায়ীত্ব গ্রহন করে। যে বছর যে শহরে এই সম্মেলন অনূষ্ঠিত হবে সে শহরের সংগঠনগুলো নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সম্মেলনের সমস্ত দায়ীত্ব বহন করে। নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রতি বছর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশী সংগঠন ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে সকলে অংশ গ্রহন করে। এই সম্মেলনকে বাঙালীদের একটা মিলন মেলা বলা যায়। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে, একে অপরের সাথে মিলে। শিল্পী সাহিত্যিক আসে, দু বাংলা থেকে আসে সাংস্কৃতিক দল। বাঙালীদের এক আনন্দ উৎসব।

আনিস বলল, এই উৎসব তো বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের মাধ্যমেও করা যেত। আর একটা সম্মেলন করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

বঙ্গ সম্মেলন আর বাংলাদেশ সম্মেলনের মাঝে বেশ পার্থক্য আছে। যেমন বঙ্গ সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার স্থান পায় না। বঙ্গ

সম্মেলন মূলত এখানকার বাঙালীদের জীবন যাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিষয় মুখ্য স্থান পায়। রাজনীতি ও ধর্মিয় আলোচনা করা হয় না। আর বাংলাদেশ সম্মেলনে এখানকার প্রবাসীর ব্যাপার ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বাংলাদেশী শিল্পী সাহিত্যিকদের মর্যাদা দেয়া হয়। এই সংগঠন দু বাংলার শিল্পী সাহিত্যিককে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হয় যা বঙ্গ সংস্কৃতি করে না।

তা না হয় বুঝলাম প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে কিন্তু আরও যে শত শত সংগঠন হয়েছে সবগুলোরই কি প্রয়োজন ছিল?

এই যেমন বাংলাদেশে কালচারাল সেন্টার, সন্দ্বীপ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি,ঝংকার সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, বাংলাদেশ থিয়েটার অব আমেরিকা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে আলাদা একটা প্রয়োজনে। যা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন বা বঙ্গ সঙ্ঘ ঠিক ভাবে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি বলেই এ ধরনের আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত। কোনটা নিক্রিয় নয়, যার যার কর্মে সকলেই ব্যস্ত আছে এবং নিজেদের নিয়ে উপভোগ করছে তাদের আশা অনুযায়ী। ক্ষমতার দ্বন্দে বেশিরভাগ সংগঠনই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। তারপরও সবাই ব্যস্ত আছে। প্রতিযোগিতা আছে কোন সংগঠন প্রবাসীকে কি উপহার দিতে পারছে। সামারে দেখবেন প্রতি উইকএন্ডে কত অনুষ্ঠান! কম বেশি আনন্দ উপভোগ করছে। এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফেলে আসা জীবনের স্বাদ পেতে চেষ্টা করছে।

পরিচয়পর্ব শেষ হলে বাহার ভেতরের দিকে মুখ করে বলল, বিন্দু, তোমার মেহমান এসে গেছে। নাস্তার দাওয়াত ছিল কিন্তু।

ভেতর থেকে উত্তর এল, তোমার মেহমান আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ কেন?

বলতে বলতে চায়ের ট্রে নিয়ে টেবিলে রেখে বলল, আমি যেদিন দাওয়াত দেব সেদিন হবে আমার মেহমান। আজ তোমার। বলে আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর মেহমানদের খুব বেশি যত্ন করিনা। এই সামান্য নাস্তা, শুরু করে দাও। তোমাকে দাওয়াত দিয়ে আমাকে বলেছে। অনেক সময় মানুষকে দাওয়াত দিয়ে আমাকে বলতে ভুলে যায়। ওর এক বন্ধু একদিন তো রেগে আগুন। দুজনকে দাওয়াত করে আমাকে বলেনি। মেহমান যখন ঘরে এল তখন বলল, ওহ্হু, আমি তো ভুলে গেছি তোমাকে বলতে। তখন ঝামেলা হয় আমার। সামলাতে হয়। খুব কাছের যারা তাদের তো আমাদের সাথেই বসিয়ে দেয়া যায়। নতুন মেহমানদের তো একটু আলাদা করে কিছু করতে হয়। দাওয়াত দিয়ে ভুলে যাওয়া তার অভ্যেস অনেক দিনের। বাংলাদেশেও অনেক জ্বালিয়েছে।

একটা সালাম দিয়ে আনিস বলল, আরে আমারও তো সেই রোগ! আমিও তো আমার এক বন্ধুকে আসতে বলেছি এখানে। যদিও ওর আসতে একটু দেরী হবে বলেছে। আমার অনেক দিনের বন্ধু। দেখা হয়েছে। কথা বলার সুযোগ ছিলনা। আপনার অনুমতি না নিয়েই তাকে আসতে বলেছি। অন্যায় করে ফেলেছি।

না, না অন্যায় কিসের? আরও তো অনেকে আসবে। তার সাথে আর একজন বেশি হলে এমন ক্ষতি কি? তাছাড়া আমি তো তার জন্য আলাদা কিছু করতে যাচ্ছিনা। আসুক। এদেশে দু'একজন বাড়তি মেহামান এমন কিছু নয়।

আপনার মেহমান হব কোনদিন ভাবী?

যে কোনদিন। আমার মেহমানদের দিনক্ষন ঠিক করে দিইনা। সব সময় খোলা।

তাহলে তো খুব মজা। করিম চাচাদের রান্না খেতে খেতে মুখের চামড়া বদলে গেছে। এখানে এসে মাঝে মাঝে পুরোনো স্বাদের সন্ধান পাওয়া যাবে।

হ্যা, তা পাবে, তবে মেজাজটা ঠিক থাকলে, বাহার বলল। মাঝে মাঝে এমন রান্না হয় যা একবার খেলে তুমি জীবনে ভুলবেনা। কোনদিন এ বাসায় আসার চিন্তাও করবেনা।

না, না ওর কথায় বিশ্বাস করবেনা। এ রকম হয়, তবে বছরে দু একবার হয় কিনা সন্দেহ।

বছরে দুএকবার হলে সেটা মেনে নেয়া যাবে। তাতে আমার কোন অসুবিধে হবেনা। তাহলে কাল থেকে আমি এই খোলা মেহমানদারীর একজন হয়ে গেলাম কিন্তু।

আমার কোন আপত্তি নেই।

টেবিলে কয়েকটা বাংলা কাগজ পড়ে আছে। আনিস একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়েই কথা বলছিল। চোখ বুলাবার সুযোগ হয়নি। ভাবী চলে যেতেই বাহার বলল, শুরু কর। আনিস একটা প্লেটে পরোটা মাংশ নিয়ে মুখে তুলে কাগজটার দিকে নজর দিল। ঠিকানা পত্রিকা। জিজ্ঞেস করল, বাহার ভাই এখানে কতগুলো বাংলা পত্রিকা আছে?

বর্তমানে বোধ হয় চারটা, প্রবাসী, ঠিকানা, বাঙালী ও পরিচয়।

এতগুলো কাগজ এখানে চলে?

চলে কি চলেনা তা জানিনা। তবে বাজারে এখনও আছে। অনেকগুলোর অকাল মৃত্যু হয়েছে। এটা বাংগালীর একটা ব্যবসা। যেটা ধরে সেটা একবারে শেষ মাথায় না গিয়ে ছাড়েনা। প্রথম ছিল একটা, দেখাদেখি আরও অনেকগুলোর জন্ম নিল, কেউ টিকে আছে, কেউ হারিয়ে গেছে। যারা পত্রিকাকে ব্যবসায়ীক ভাবে নিতে পারেনি, তারাই হারিয়ে গেছে।

কবে থেকে বাংলা পত্রিকার শুরু?

প্রথম বাংলা পত্রিকা 'সংবাদ বিচিত্রা', বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের উদ্দ্যোগে যাত্রা করেছিল ১৯৭১ সালে। অনেক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে এখনও নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। রণজিত দত্তের সম্পাদনায় এবং পরিশ্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়নি। তখনকার সময়ে খবর আদান প্রদানের একমাত্র পত্রিকা সংবাদ বিচিত্রা। তারপর সময়ের দাবী এবং প্রবাসীর প্রয়োজনে জন্ম বিভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়ে অনেকেই আতুড়ঘরেই হারিয়ে গেছে। সংবাদ বিচিত্রার পর দিগন্ত নামে একটা পত্রিকা বের হয়েই হারিয়ে যায়। তারপর পরবাস নামে একটা কয়েক সংখ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আসে প্রবাসী। সৈয়দ মুহাম্মদুল্লার সম্পাদনায় এখনও নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। ব্যবসায়িকভাবে প্রবাসী স্বার্থক দেখে আরও পত্রিকা প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। বাজারে এল ঠিকানা,সম্পাদনায় এম এম শাহীন, তারপর বাঙালী, সম্পাদনায় কৌশিক আহম্মদ, ও পরিচয়,সম্পাদনায় নাজমুল আহসান।

সব ব্যবসাতেই আমাদের মাঝে একটা নীরব প্রতিযোগিতা দেখবে। এই দেখনা, গ্রোসারী ব্যবসা। এই ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে ছিল একটা। দেখাদেখি হয়ে গেল ডজনের উপর। আমাদের লোকসংখ্যা অনুযায়ি ভাগ করে হিসাব করলে দেখা যায় এতগুলো এক জায়গায় চলতে পারেনা। তারপরও চলছে। অবশ্য অনেকগুলো হাতবদল হয়েছে কয়েকবার।

বিদেশীরা আসেনা এসব দোকানে?

খুব কম। এসব গ্রোসারী বাঙালীর উপরই নির্ভর করে। কিছু ফাও ব্যবসাও করে কেউ কেউ।

সেটা আবার কেমন?

দোকানের বেইসমেন্টে কেউ কেউ আসরের ব্যবস্থা করেছে। সেখানে জুয়া খেলা চলে। যারা খেলে তাদের লোকশান, যাদের ওখানে খেলে তাদের লাভ। প্রতিদিনই চলে খেলা। এমন কেউ আছে মনে হয় তারা এই স্বপ্ন নিয়েই এসেছিল আমেরিকায়। জুয়া খেলে বড় লোক হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সর্বসান্ত হয়ে ঘরে পড়ে থাকে। দেশে মাবাপ ভাইবোন না খেয়ে কষ্ট করে। মনের দুঃখ ভুলতে নেশা করে। একবার নেশায় জড়িয়ে গেলে আর ছাড়তে পারেনা। তখন দেশে কারা আছে, কেমন আছে তা ভুলে যায়। রাতদিন গাধার মত খেটে যে টাকাটা কামায় তা দিয়ে দেয় জুয়ার আসরে। আমি দুজনকে জানি যারা সব সময় নেশায় মগ্ন থাকে, বেতনটা পেয়েই ছুটে যায় বেইসমেন্টে।

এখানেও জুয়া খেলা চলে?

চলবেনা কেন? এখানে তো আরও সুবিধে। এমন সময় ঘরে একজন এসে ঢুকল। বাহার পরিচয় করিয়ে দিল। আমার পুরাতন বন্ধু জাফর। বাংলাদেশে ডাক্তার ছিল, হালে ট্যাক্সি চালায়। ভবিষ্যতে ডাক্তারিতে ফিরে যাবার বাসনা আছে। আমেরিকান ডাক্তার হবার স্বপ্ন ছিল, এখনও আছে। তাই আগামি সে□ স্বর থেকে কলেজে যাওয়া শুরু করবে।

ডাক্তার হলে আবার কলেজে যেতে হবে কেন, আনিস জিজ্ঞেস করল।

যত সার্টিফিকেটই থাক, এখানকার কোর্স পাশ করতে হবে। তারপর এদেশে স্বীকৃতি পাবে। জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা জাফর, তুই একা এলি যে? ভাবী কোথায়?

আর বলিস নে, কথা ছিল আজ ও গাড়ি চালাবেনা, কিন্তু একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে গাড়ি নিয়ে যেতে হয়েছে। কারণ গাড়ীর ভাড়া আগেই দেয়া আছে। না গেলে টাকাটা মার যাবে।

আনিস হা করে তাকিয়ে আছে দেখে বাহার জিজ্ঞেস করল, তুমি হা করে তাকিয়ে আছ। মনে হয় কথাগুলো ঠিক ধরতে পারনি। তারা দুজনেই ট্যাক্সি চালায়। দুজনের মাঝে চুক্তি হয়েছে, আগে জাফর তার কোর্সটা শেষ করবে, তারপর কাজ শুরু করলে ভাবী ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তার ওকালতিটা শেষ করবে। এবার বুঝলে কিছু?

ভাবী ট্যাক্সি চালায়? এ যে অবিশ্বাস্য!

দেখলেই বিশ্বাস হবে। বঙ্গললনা সুযোগ পেলে যে কি করতে পারে তা চোখে দেখলেই বিশ্বাস করবে। আরও অনেক কিছু আছে যা তোমাকে ধাঁধাঁয় ফেলে দেবে। বিশ্বাস হবেনা। তারপরও বিশ্বাস করতে হবে। পরিবেশ পরিস্থিতি আর ঘটনা কথা বলবে। বিশ্বাস করতে হবে।

নতুন অতিথি এস ঢুকল। বাহার বলল, তমি তো রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলছ নিখিল। মাত্র এক ঘন্টা দেরীতে এসে পৌঁছতে পারলে। বলল, এ হচ্ছে আমার বন্ধু নিখিল, কোনদিনই সময় ঠিক রাখতে পারেনা। এদেশে আছে বার বছর। পেশা, ফাইনানসিয়েল সার্ভিসেস। মানে ইধার কা মাল ওধার করা। তুমি যদি বাড়ী কিন তাহলে সে তোমার মর্টগেজ করে দিবে, গাড়ী কিনবে, সে লোনের ব্যবস্থা করে দেবে, বিজনেস লোন, ব্যক্তিগত লোন সব করে দেবে। মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি করুণা বৌদি আর এই তাদের একমাত্র সন্তান অন্তরা।

কয়েক মিনিট পর এল তিনটা বাচ্চাসহ এক পরিবার। বাহার বলল, এই হল আমাদের শাহজাহান। কাজ করে একটা স্প্যানিশ রেষ্টুরেন্টে। বেতনের চেয়ে টিপস বেশি পায়। সময়ের কোন আগামাথা নেই। পাশে যিনি তিনি হলেন তার অর্ধাঙ্গিনী মলিনা ভাবী। অঙ্গের অর্ধেক তো বটেই এবং সংসারের অর্ধেক বা তার বেশি আয় করেন তিনি। সেলাইর কাজ করে যথেষ্ট আয় করেন। বাঙালী মহিলাদের যত রকম পোষাক প্রয়োজন তিনি তৈরি করেন। প্রায় সকলেই মলিনা ভাবীকে চিনে। শাহজাহান আদমশুমারী মেনে চলে। তিনটে বাচ্চার বেশি চায় না। কিন্তু একটার বেশি স্ত্রী পছন্দ করেন না। কথাবার্তা খুব কম বলে। দুএকটা যা ছাড়ে একবারে মাত করে দেয়। শুনে বেশি, বলে কম।

আনিস বলল, যারা কথা কম বলে, কাজ বেশি করে তারা কিন্তু বিপজ্জনক।

সকলেই হেসে উঠল।

এসময় একজন ঘরে ঢুকতেই বাহার বলল, তুই এসব নিয়ে এলি কেন? এতগুলো আপেল, আঙুর খাবে কে? এদেশে বাঙালিরা এসব ফল খায়? বাংলাদেশে থাকতেই শুধু খেত। কেনার সামর্থ না থাকলে দোকানের দিকে হা করে তাকিয়ে জিহ্বার জল ফেলত। সেই লোকই এখানে এসে বছরেও একটা আপেল ছুয়ে দেখেনা। প্রথম প্রথম দুএকটা খায় ঠিকই। তারপর শখ মিটে যায়। এত ফল এনে তুই আমাকে একটা বিপদে ফেলে দিলি। না পারব খেতে না পারব ফেলতে। আয় ভেতরে আয়। বলল এই হচ্ছে ইমিগ্রেশন ফাইটার বাদল।

এ আবার কি ধরনের প্রফেশন বাহার ভাই? আনিস জিজ্ঞেস করল।

ইমিগ্রেশন ফাইটিং কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি তা সব বলব। এদেশে এসেছ, অনেক কিছুই শুনবে, জানবে - যদিও এসব তোমার প্রয়োজন নেই।

এদিকে একটু আসবে? বিন্দুর ডাকে বাহার জিজ্ঞেস করল, কি আদেশ তাই বল।

প্লেটগুলো টেবিলে সাজাও।

'জ্বি হুকুম' বলে বাহার কাজে লেগে গেল। আনিসও লেগে গেল কাজে। এরই ফাঁকে আনিসকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধু এলনা এখনও?

ও বলছিল একটু দেরী হবে।

একটা কল করে দেখ বের হয়েছে কিনা।

আনিস কল করার জন্য ফোনটা হাতে নিতেই কলিং বেলটা বেজে উঠল। আনিসই গেল দরজার দিকে। দরজা খোলাই ছিল। কপাট খুলে দেখে আমান দাড়িয়ে।

আয়, ভেতরে আয়। ঠিক সময়েই এসেছিস। এই যে বাহারভাই, এসে গেছে বাড়তি মেহমান।

কে বলে বাড়তি মেহমান, উনি আমার মেহমান, ভেতর থেকে বিন্দু বলে উঠল। আমার মেহমান তোমাদের সাথে খাবেনা, আলাদা খাবে।

যাক বাঁচা গেল, বাহার বলল। তাহলে তোমরা হলে আমার মেহমান। তোমাদের দেখাশুনা আমারই করতে হবে। চল দেখি কার মেহমান কে বেশি যত্ন করতে পারে!

আনিস বলে উঠল, আমি তাহলে মেহমান নই, এ ঘরের একজন বলে বাহারের সাথে টেবিল সাজাতে লেগে গেল।

নিখিল এতক্ষন চুপ চাপ বসে সব শুনছিল। ডাইনিং টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে বাহারকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আনিসকে ট্রেনিং দিচ্ছ?

ট্রেনিং আবার কিসের? এখানে এলে সবাই অটোমেটিক ট্রেইন্ড হয়ে যায়। দেখনা, আমাদের বাদল, যে কোনদিন কোন ঝামেলায় যায়নি, যেতে চায়নি। এখন সে কতগুলো যুদ্ধ করে যাচ্ছে? তাকে তো কেউ ট্রেনিং দেয়নি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা করতে হয়েছে আর তাতেই সে এমনিতেই ট্রেইন্ড হয়ে গেছে। কেউ কাউকে শেখাতে হয়না। নিজে নিজেই শিখে যায়। অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, আর এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয টাকা গচ্ছা দিয়ে। বাদলকে জিজ্ঞেস করে দেখ কত টাকা মানে কত ডলার দিয়েছে ইমিগ্রেশনকে এবং উকিলকে? তারপরই তো বাদল এখন ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট। মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে দুপয়সা কামায়।

আনিস জিজ্ঞেস করল, ঘটনাটা খুলে বলুন না, বাহার ভাই।

ঘটনা কিছুই নয়। এখানে আছে আজ বার বছর, অথচ কোন কাগজ নেই। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই সাগর শুকিয়ে যায়। একটা ঘাপলা লেগে যায়। প্রথম দরখাস্ত করেছিল লুলাক নামে একটা প্রোগ্রামে। এর কোন খবর নেই। তারপর ১৯৮৮তে এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কার হিসেবে। উকীল ওয়াকারের মাধ্যমে। তাতে যে কোম্পানীর কাগজ দিয়ে দরখাস্ত করেছিল তা ছিল দু নম্বর। তাই সেটা হয়নি। তারপর দরখাস্ত করেছিল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে। সেখানেও যে সব কাগজ চেয়েছিল তা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কয়েক বছর এর পেছনে ঘুরে ঘুরে এবার করেছে ওপি ওয়ান লটারি। যদি লেগে যায় তো হয়ে গেল। তা না হলে সেই রাজনৈতিক আশ্রয়ের দরখাস্ত নিয়ে আপীল চলছে। চলবে, চলতে থাকবে। এর মাঝে বাদল ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট হয়ে গেছে।

তাহলে তার নিজের কাগজের কি হবে?

এমনি করে চলবে যতিদিন পারা যায়। এর মধ্যে অন্য সুযোগ খুজতে হবে, হয়েও যাবে একটা কিছু।

টেবিল পুরোপুরি সাজানো হয়ে গেলে বিন্দু বলল, তোমরা শুরু করে দাও। বিন্দুর সাথে মিসেস নিখিল মানে করুণাও রান্নাঘরে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। বাহার বলল, তোমরাও এসে যাও, এক সাথে বসি।

না, তোমরা শেষ কর, তারপর আমরা আরাম করে পরে বসব।

প্রায় পাঁচাটার দিকে আর একবার চায়ের আসর শেষ করে সবাই একে এক বিদায় হল। যাবার বেলায় করুণা দাওয়াত করে গেল আগামী রোববারের জন্য। নিখিল একটা এনভেলাপ বিন্দুর হাতে দিয়ে বলল, এটা আপনার কাছে রেখে দিন।

এর মধ্যে কি আছে? এখন তো টাকা পয়সার দরকার নেই। যখন লাগবে তখন বলব।

একই তো কথা। বাহারের এখন কাজ নেই। প্রয়োজনে এনভেলাপটা কাজে লাগবে। আর না লাগলে তো যে কোন সময় ফেরত নেয়া যাবে বলে বেরিয়ে গেল।

-১৩-

চাচার ভ্যানে করেই আনিস তার বিছানাপত্র নিয়ে আমানের এখানে পৌঁছল। চাচা নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছেন। চাচীও সাথে এসেছেন। চাচা বলেছিল, তোমার গিয়ে কাজ নেই। সুসান বলল, ছেলে

কোথায় কার সাথে থাকবে তা নিজ চোখে দেখে আসব। আমানের জিনিষপত্র এমন কিছুই নেই। একটা খাট আর বিছানা। ঘর দেখে চাচা চাচি দুজনেই খুশি হলেন। দোতলায় তিনটে বেডরুম, লিভিংরুম। প্রতিরুমে দুজন করে থাকে। সকলেই ব্যাচেলর। আমান পরিচয় করিয়ে দিল দুজনের সাথে। বাকী দুজন কাজে। সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে এক সময় চাচা চাচী চলে গেলেন।

আনিস আমানকে নিয়ে স্মৃতি রোমন্থনে বসল। কথা শেষ হয়না। অতীতের স্মৃতিকথা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা, তিক্ততা, ব্যর্থতা, হতাশা, আনন্দবেদনা ইত্যাদি গল্পের শেষ হয়না। এক সময় আমান আনিসকে কিছু নিয়মকানুনের কথা জানাল। এখানে আমরা পাঁচজন ছিলাম। এখন তোমাকে নিয়ে ছয়জন। তিনটা রুম কিন্তু বাথরুম একটা। তাই একটা নিয়মের ভেতর বাথরুম ব্যবহার করলে সমস্যা হয়না। সকালেই একটু অসুবিধা হয়। তাই সকালে সময়টা ভাগ করে নির্দিষ্ট করা আছে। হানিফ ভাই আর রফিক কাজে যায় ৭টায়। জগলু আর কাশেম যায় আটটায়। এই সকালের সময়টা এই চারজনের জন্য ভাগ করে দেয়া হয়েছে। হানিফ ভাই বাথরুম শেষ করবে ৬টার মধ্যে, রফিক ৬টা থেকে সাড়ে ছয়টা, জগলু আর কাশেম সাড়েসাতটা আটটা পর্যন্ত। আমার কাজ শুরু হয় দুপুরে। তাই আমার কোন তাড়া নেই। তোমারও কোন কাজ নেই। শুধু সকালবেলাটা বাথরুম দখল করা যাবেনা। এটা জানালাম এইজন্য যে তুমি না জেনে ব্যবহার করতে গেলে তাদের কারও দেরী হলে কাজের ক্ষতি হবে। খাওয়াদাওয়া আমি আলাদা করি। কারন রান্না করা আমার দ্বারা হয়ে উঠেনা ঠিক সময় মত। ওরা চার জন এক সাথে রান্না করে। পালা করে একজন একদিন রান্না করে। আমি আমার সুবিধেমত কিছু একটা করে নিই। বেশিরভাগই বাইরে খেয়ে নিই। তুমি যখন এসে গেছ, তাহলে এখন থেকে একটা ব্যবস্থা করতে হয়। তুমি ত বোধ হয় রান্নার কিছুই জাননা। শিখে যাবে। প্রয়োজনে মানুষ সবই শেখে, শিখতে পারে। আমিও কিছুই জানতাম না। এখানে এসে অনেক কিছু শিখতে বাধ্য হয়েছি। যা কোনদিন প্রয়োজন মনে করিনি। নিজের দায়িত্ব নিজকেই নিতে হবে। রান্নাও শিখে ফেলেছি। রান্না কত প্রকার ও কি কি উদাহরন এবং নমুনা সহ তোমাকে শিখিয়ে দেব। রান্না প্রধানত দু প্রকার। সহজ রান্না আর ঝামেলার রান্না। সহজ রান্না হল ভাত, ডিম, আর আলু। এই তিনটা খেতে চাইলে এক সাথেও করতে পার আবার আলাদা ও করতে পার। ধর, ভাতের সাথে ডিম বা আলু দিয়ে দিলে। ভাত হয়ে গেলে ডিম আর আলু আলাদা করে ভর্তা করে নাও। ব্যাস, সোজা রান্না হয়ে গেল। আর ঝামেলায় যদি যেতে চাও তাহলে মাছ বা মাংস রান্না কর। তাতে সময় একটু বেশি লাগে। পদ্ধতি জানতে হবে। সেও সোজা পদ্ধতি। একদিন দেখলেই শিখে যাবে। তবে মজার মজার খেতে হলে একটু কষ্ট করতে হয়।

আরে ফ্যানেভাতে একটা খেতে পারলেই হল। অত মজার দরকার নাই। আনিস বলল। আমাকে দুদিন দেখিয়ে দে, একদিন রান্না করব আর ছয়দিন খাব। ও নিয়ে চিন্তা করিনা। চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

হ্যা, চল তোকে চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ দেখিয়ে আনি। এখান থেকে তিন চার ব্লক। নুরু ভাইর বাসা এখান থেকে দশ মিনিট। এই এলাকাটা বাঙালি ভর্তি। বাঙালি সবাই কাছাকাছি থাকতে চায়। ঝগড়া ফ্যাসাদ করে, আবার কাছাকাছি না থেকেও পারেনা। এই দেখনা যত নতুন মানুষ আসে, এসেই খোঁজ নেয় কোন দিকে বাঙালী থাকে। এবং

সে দিকেই থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। শুধু বাঙালীই নয়, পৃথিবীর সব দেশের মানুষের ধর্মই যেন নিজের দেশের মানুষের কাছাকাছি থাকা। বাঙালীর আর একটা এলাকা আছে। সেটা এষ্টোরিয়া। ওখানে বেশিরভাগ সিলেটের মানুষ। আর এদিকটায় চিটাগাং আর সন্দ্বীপের মানুষ বেশি। নিউইয়র্ক শহরে এমনি ভাগ করে মানুষ বাস করে। গায়েনার মানুষ থাকে জামাইকা, ওজোন পার্ক, তার পাশে থাকে শ্রীলঙ্কা আর ইন্ডিয়ান মানুষ রিচমন্ডহিলের দিকে। পাকিস্তানী থাকে কনি আইল্যান্ড আর প্রসপেক্ট পার্কের কাছাকাছি। এসব মানুষ নিজেদের অজান্তেই যেন আপন জনের কাছাকাছি চলে যায়। কিসের টানে কে জানে!

চার্চ এভিনিউতে এসে আনিস অবাক হয়ে গেল। এ যে ফকিরাপুলের বাজার! রাস্তার দুপাশে ফুটপাথে বাঙালীর ভীড়। আজ যেন ঈদ, সবাই এসেছে মিলিত হতে। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কেউ কেনা কাটা করছে, রাস্তার দুপাশে অনেকগুলো গ্রোসারী, বাংলায় সাইন বোর্ড লেখা, সব ক'টা দোকানেই ভীড়। রেষ্টুরেন্টগুলো ভর্তি। মনে হয় বিরাট উৎসবে মেতে আছে সকলে। আজ ছুটির দিন। সকলের ছুটি। তারা কত আনন্দে আছে! ছুটি ভোগ করছে! আমানকে বলল, এযে দেখছি এক বিরাট আনন্দ উৎসব! বাঙালীরা এত সুখে আছে এদেশে!

না রে, সুখে নেই। তুই মনে করেছিস সকলেই আনন্দ করতে এসেছে? না, তা নয়। কেউ এসেছে একটা কাজের খোঁজে। এখানে এলে অনেকের সাথে দেখা হবে, এই ফাঁকে নিজের বা আপন কারও জন্য কাজের কথা পাড়বে। কেউ এসেছে পাওনা আদায় করতে, কেউ এসেছে চিঠিপত্র বা টাকা পয়সা পাঠাতে। কে কখন দেশে যাবে খবর নিতে। বলতে পারিস এটা মিলনমেলা এবং আদানপ্রদানের মেলা। আবার কেউ এসেছে পার্টির কাজ করতে, ক্যানভাস করতে।

এখানে আবার ক্যানভাস কিসের?

ইলেকশনের।

কিসের ইলেকশন?

আওয়ামী লীগ আর বিএনপির ইলেকশন।

ওরে বাপরে! তাহলে তো বিরাট ব্যাপার! এখানে ইলেকশন করে দেশের জন্য কি করবে?

দেশের জন্য কিছু করতে না পারুক, দেশে তো খবরটা পাঠাতে পারবে যে আমি এখন এই দলের সভাপতি বা এ জাতীয় একটা পদে আসীন, তাদের নাম ছাপা হবে বাংলা কাগজে, মানুষের কাছে পরিচিতি বাড়বে। এটা কি কম কথা! সামনে আওয়ামী লীগের ইলেকশান। সাত/আট মাস আগে বিএনপির ইলেকশান হয়ে গেছে। সে কি সাজ সাজ রব! বাংলাদেশেও এমন কায়দা করে ইলেকশান হয়না! একজন সহ-সভাপতি পদ প্রার্থী তো বউ হারিয়ে ফেলেছেন ইলেকশান করতে গিয়ে।

কি বলছিস তুই! ইলেকশান করতে গিয়ে বউ হারিয়ে ফেলেছে? এটা কেমন করে!

তাহলে শোন, পুরো ঘটনাটা বলি। ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় এই এখানে গ্রোসারী ষ্টোরে। বাজার করতে এসেছিল। সাথে দুটো বাচ্চা, একটা তিন বছরের আর একটা চার বছরের। ছোট বাচ্চাটা এত চঞ্চল যে ধরে রাখতে পারেনা। আমি বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বাচ্চা দেখলেই ভেতরটা হু হু করে উঠে। চলে যাই আমার বাচ্চাদের কাছে। ইচ্ছে হল সেই চঞ্চল বাচ্চাটাকে একটু কোলে নিই। ভদ্রলোককে

বললাম, বাচ্চাটাকে একটু কোলে নিতে দিন না। তিনি বললেন, এ বাচ্চা কোলে উঠার বাচ্চা নয়। দেখুন না কি জ্বালাতন করছে। আমি বাচ্চাটাকে কাছে আনতে চেষ্টা করে পারলাম না। এক সময় জোর করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম। আহ্ কি শান্তি! এ সময় ভদ্রলোকের স্ত্রী এসে হা করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বলল, আপনাকে বুঝি খামচে দিয়েছে!

বললাম, না, বরং আমিই খামচে দিতে চাইছি। তারপর তাদের ঠিকানা নিলাম, যখন সময় পেতাম চলে যেতাম তাদের বাসায় বাচ্চাগুলোকে দেখতে। এই তো প্রসপেক্ট পার্কে তাদের বাসা। তাদের সাথে আমার এমন ভাব হয়ে গেল যে তারা বাইরে চলে গেলে আমি বাচ্চা নিয়ে সময় কাটাতাম। সেই ভদ্রলোক ইলেকশানে নামল। পাশ করতে হবে, আরও কয়েকজন প্রার্থী একই পদের জন্য। জোরেশোরে চলল প্রচারণা। ভদ্রলোকের নামটা ধর জামান। কনষ্ট্রাকশনের কাজ করে অনেক টাকা করেছে, বাড়ী কিনেছে দুটো, তারপর বাংলাদেশে গিয়ে সুন্দরী যুবতী দেখে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। জামানের বয়স চল্লিশের উপর। তার স্ত্রীর বয়স সতের আঠার। সুন্দরী। নির্বাচনের প্রচারকার্যের জন্য যুবক ছেলেদের নিয়োগ করলেন। মনে হল যেন ঢাকায় নির্বাচন চলছে। রাতদিন কাজ চলছে। পাশ করতে হবে। কর্মিদের জন্য দ্বার খোলা। যখন তখন আসা যাওয়া। সকলেই ব্যস্ত। খাওয়া দাওয়া ফ্রি। এই সুযোগে জামানের স্ত্রী মিলার অনেক নাম হয়ে গেল। সকলেই মিলা ভাবী বলতে অজ্ঞান। প্রাণ খুলে সকলকে আপ্যায়ন করে। খোলাখুলি কথাবার্তা বলে। কার সাথে কোথায় কি করছে, কিভাবে আপ্যায়ন করছে তা খেয়াল করার অবকাশ নেই জামানের। তার একটাই লক্ষ - যেভাবেই হোক পাশ করতে হবে। একদিন বাইরে প্রচারনার এক সভা থেকে রাতে ঘরে ফিরে দেখে বাচ্ছা দুটো কেঁদে সারা হচ্ছে। মিলা নেই। নেই তো নেই, কোথায়ও নেই। কোন উপায় না দেখে আমাকে কল করল। আমি গিয়ে বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সেখানেই থেকে যাই। তারপর চলল গরুখোজা। পুলিশে খবর দেয়া হল। রিপোর্ট হল। কিন্ত মিলা নেই।

দু সপ্তাহ পর লোক মুখে খবর পাওয়া গেল মিলা চলে গেছে আফসারের সাথে, যে ছেলেটার বয়স ২৪/২৫ হবে, সব সময় ঘরের কাজে মিলাকে সাহায্য করত, তার সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে। আবার খবর এল দেশে চলে গেছে। এক সময় জামান বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দেশে চলে গেল। তার মায়ের কাছে রেখে ফিরে এল। তখন নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। ব্যর্থ হয়েছেন সব দিক থেকেই।

এখানে রাজনৈতিক কাজকর্ম কিভাবে চলে?

এসব খবর মিলবে রেষ্টুরেন্টে গেলে। এই যে রাস্তার এপাশে যে রেষ্টুরেন্ট দেখছ তাতে সব বিএনপির নেতারা আড্ডা দেয়, আর ওপাশে আর একটা রেষ্টুরেন্ট দেখছ, ওটাতে সব আওয়ামী লীগ নেতারা আড্ডা দেয়। তুমি যে দলকে সাপোর্ট কর সে দলের রেষ্টুরেন্টে গেলেই সব খবর পাবে। দেখবে তারা দেশের সব কাজকর্ম শেষ করে ফেলছে, কোন্ কোন্ নেতার কি ভুল হয়েছে তারা সব শুধরে দিচ্ছে, তারাও ক্ষমতায় যাচ্ছে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। চল এক কাপ চা খাওয়া যাক। তবে ওই দু'রেষ্টুরেন্টে নয়, অন্যটায় চল। তারপর কিছু বাজার করে ঘরে ফিরে যাব।

বাহার ভাই আমানের এখানে চলে এসেছি। আপনার খুব কাছে এসে গেলাম।

তা হলে তো ভালই হল। আর কয়জন আছে সে বাসায়?

আমান একাই থাকে একটা রুমে। সে বাসায় আরও লোক আছে। আমরা দুজনে আবার এক সাথে হয়েছি এটাই বড় কথা।

খুব ভাল খবর। এখন তো আর দূরে নও, চলে আস গল্প করা যাবে। দেখি বিকেলে আসতে পারি।

টেলিফোনটা রাখার সাথে সাথেই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল।

হ্যালো, কে বলছেন?

আমি নিখিল বলছি। কেমন আছ? আজ বিকেলে কি করছ? চলে এসো, একটা মিটিং আছে।

কিসের মিটিং?

আওয়ামী লীগের মিটিং।

এই প্রবাসে মিটিং করে কি হবে? দেশের কি কাজে লাগবে?

দেশের কাজে না লাগুক, এখানকার কাজ তো হবে।

এখানে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি করে কি কাজ হবে?

অনেক ধরনের কাজ। এই ধর নিজের নামটা কাগজে ছাপা হবে, নেতা হিসেবে পরিচিতি হবে। একটা রাজনৈতিক পার্টি থাকলে তার বিপরিতে আর একটা পার্টি না থাকলে তো মান রক্ষা হয়না। পার্টির প্রতিযোগিতা চলছে এখানে। কাজ কিছু হোক বা না হোক। কাজের কথা বড় নয়, এখানে নিজের নামের কথাটাই বড়। নেতা হবার বড় সখ এই প্রবাসী বাঙালীর। আর এসব মিটিংএ না গেলে অনেক কিছু থেকেই তুমি বঞ্চিত হবে। অনেক শিক্ষার আছে এসব সভাসমিতিতে।

এসব সভাতে শিক্ষার কি আছে?

আছে, অনেক কিছু আছে। এসেই দেখনা। কত রকমের সমিতি আছে জান? বিয়ানি বাজার থেকে শুরু করে বড়লেখা, ছোটলেখা সমিতিও আছে। বর্তমানে মোট সমিতি/সংগঠনের সংখ্যা ১৭২। এর মাঝে পাবে যার যার জেলার, থানার নেতাদের নিয়েও সমিতি। সমিতি করেই কাগজে খবর পাঠায় অমুক সভাপতি, তমুক সেক্রেটারি ইত্যাদি। তারপর কিছুদিন পর নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল হয়, ভাগাভাগি হয়। এগুলো দেখতে আমার খুব মজা লাগে। আমি সব সভাতেই যাই। কিছু শিক্ষা গ্রহন করার জন্য। সন্দীপ গ্রোসারীর সামনে আমি থাকব। তুমি চলে এসো।

গ্রোসারীর সামনে এসে দেখে নিখিল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে বাহার। বাহারকে দেখে আনিস আরও খুশি হল। নিখিল বলল, তুমি এসব মিটিং ফিটিংএ না এসে অনেক মজা থেকেই বঞ্চিত থাকবে। গত সপ্তাহে একটা সভা ছিল। ওসমানি স্মৃতি সংসদ। বক্তারা মরহুম জেনারেল ওসমানি সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। শুধু এইটুকুই জানে তিনি তাদের জেলায় জন্মগ্রহন করেছিলেন। এটাই তাদের গর্ব। তারা যখন বক্তৃতা দিচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ওসমানি শুধু তাদের লোক। বাংলাদেশের কেউ না। শুধু ওই অঞ্চলেরই তিনি। যেসব কথাবার্তা বলে তা শুনলে গা জ্বালা করে। বেশিক্ষন দাড়াতে পারবেনা। বক্তৃতার তোড়ে অন্য এলাকার বাঙালিকে তারা ছোড়ে ফেলে দেয়। মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট কথা বলে বসে স্বয়ং ওসমানি শুনলেও আতকে উঠতেন। এমনি আরও আছে। শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ। একই ধরনের বক্তৃতা। ছোটদের বই থেকে কিছু পড়ে নিয়ে জ্বালাময়ি বক্তৃতা ঝাড়ে। এখানে

নেতা হবার সখ অনেকের। সব নেতাদের নামে যখন সংগঠন হয়ে গেছে তখন নিজেদের অঞ্চল নিয়ে, থানা নিয়ে সংগঠন করে। যেমন বাংলাদেশের একটা এলাকার নামে বড়লেখা সমিতি করা হয়েছে। বিরাট সংগঠন। সদস্যের চেয়ে তার কার্যকরী কমিটির লোকসংখ্যা বেশি। তার মধ্যেও অনেকে বাদ পড়ে গেছে। তাই তারা আর একটা করেছে ছোটলেখা সমিতি। এমনি চলছে সংগঠন আর তার ভাঙার খেলা। আজকের এই অনুষ্ঠানে তোমাকে কিছু লোকের পরিচয় দেব যাতে চিনে রাখতে পার। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। চল যাই।

একটা ব্লক পরেই একটা চার্চ। তার হলঘরটা ভাড়া করা হয়েছে। এখানে প্রায়ই এসব অনষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট হলঘর। প্রায় এক হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। দোতলায়ও প্রায় পাঁচ শত লোক বসতে পারে। ষ্টেজ করাই আছে। শুধু একটু সাজিয়ে নেয়া। আনিস ভেতরে ঢুকেই ষ্টেজের দিকে নজর দিল। ষ্টেজের উপর একটা ছোট টেবিল, তার তিন দিকে চোদ্দটা চেয়ার। তার পেছনে দেয়ালে আওয়ামীলীগের একটা ব্যানার। মাত্র দু'জন লোক বসে আছেন। বাকি চেয়ারগুলো খালি। পুরো হলে শ'তিনেক লোক বসে আছে। অনুষ্ঠান এখনও শুরু হয়নি। সময় দিয়েছে পাঁচটা। এখন বাজে ছয়টা। আরও কতক্ষনে শুরু করতে পারবে কে জানে। এটা বাঙালির সময়, সব খানেই। এ ধরনের সময় সবাই জানে, মেনে নিয়েছে। বা নিতে হয়েছে।

নিখিল আনিসের কানে কানে বলল, চিনে রাখ - এখন যে দুজন ষ্টেজে আছেন, ওই বামদিকে যিনি তিনি হলেন কদম আলী। আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। যত অনুষ্ঠান হয় তিনি খরচ বহন করেন। বাংলাদেশে যখন পার্টিকে কিছু সাহায্য করতে হয় তিনি দিল দরিয়া। আওয়ামী লীগের জন্য জান কবুল করতে রাজি। তিনি বক্তৃতা দিতে জানেন না। শুধু ষ্টেজে বসে থাকবেন। তিনি লেখাপড়া টিপ সই। এখানে প্রথম কনষ্ট্রাকশনের লেবার, তারপর নিজের কোম্পানী। এখন ছয়জন লোক কাজ করে তার কোম্পানীতে। বেশ টাকা বানিয়েছে। তার সদ্ব্যবহার করছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তিনি উদার হস্ত।

ডানদিকে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন সিরাজ মিয়া। চামচাগিরিতে ওস্তাদ। যত ঝামেলার কাজ, স্টেজ সাজানো থেকে মানুষ দাওয়াত দেয়া সব তিনি করেন। মিটিংএর যত খরচ হয় তার হাত দিয়ে হয়। কদম আলী পয়সা দিয়েই বসে থাকে। সিরাজ মিয়া নয়কে ছয় করে সব হিসাব মিলিয়ে রাখে। কমিটিতে কদম আলী সহ-সভাপতি, সিরাজ মিয়া কোষ্যধ্যক্ষ। সভাপতি আব্দুস সালাম। এবং আরও যারা আছে তারা এখনও তসরিফ নেননি। অপেক্ষা কর এসে যাবে।

মানুষ আসছে। হল ভরছে। সিরাজ মিয়া মাইক নিয়ে ঘোষনা করছেন। মহতি ব্যক্তিদের নাম ধরে অনুরোধ করছেন স্টেজে এসে আসন গ্রহন করার জন্য। শেষ পর্যন্ত প্রধান অতিথির নাম করলেন, প্রাক্তন সাংসদ জনাব মোয়াজ্জেম সাহেব। বক্তৃতা শুরু হল। কত সব জ্বালাময়ী বক্তৃতা। শেষ হয়না। আমরা যেন বাংলাদেশের কোন একটা জায়গায় বসে দেশ গড়ার কাজে আমাদের জীবন উৎসর্গ করছি। আমাদের আর কোন কাজ নেই। শুধুই দেশ গড়া, মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা, গরীব দুঃখিদের দুঃখ মোচন করা। যতসব বক্তৃতা করা হল তারপর দেশের আর কোন কাজই বাকী রইলনা। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সব শেষে জ্বালাময়ী ভাষন দিলেন প্রধান অতিথি। দলকে শক্ত করতে হবে, দলের অনেক খরচ আছে। তার জন্য সাহায্য করা প্রয়োজন। দেশকে গড়তে হলে দলকে গড়তে হবে। দল গড়তে হলে

ফান্ড গড়তে হবে। এই ফান্ড গড়ার জন্য সাংসদ মোয়াজ্জেম সাহেব উপস্থিত দেশপ্রেমিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। শুরু হয়ে গেল একটা প্রতিযোগিতা। কে কত ডলার দান করবেন। কেউ তৎক্ষনাত দান করলেন নগদ ডলার, কেউ নাম লিখালেন কত টাকা দান করবেন। সব শেষে যিনি দান করলেন তিনি হলেন কদম আলী। কে কত দান করল সব শুনে তিনি সবার উপরে থাকবেন। যেন কোন বাজারে কোন জিনিষের ডাক হচ্ছে। অকশান হচ্ছে। যে যত বেশি দাম বলবে সেই পেয়ে যাবে। কদম আলী সবার উপরে হাকলেন তিন হাজার ডলার। একটা খসড়া হিসেবে দেখা গেল মোট ডলারের পরিমান দাঁড়াল ছয় হাজার।

সভা শেষ হল সভাপতি আব্দুস সালামের ভাষন দিয়ে। হল থেকে বের হয়ে বাহার বলল, বুঝেছ আনিস। এই যে ছয় হাজার ডলার আজ উঠল, তা নিয়ে যাবেন এই সাংসদ সাহেব। দল গড়ার কাজে লাগাবেন এই টাকা। কিছুদিন পরপরই কেউ না কেউ আসে। কর্মিদর্শনে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সব দল থেকে। আর এমনি টাকা পয়সা নিয়ে যান। মনে হয় এখান থেকে টাকা না গেলে দলের কাজ একবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আর এখানকার এই ছাগলগুলোও নাম কামানোর জন্য অবলিলায় দিয়ে দেয়। শুধু আওয়ামী লীগই নয়, বিএনপি আরও একধাপ এগিয়ে আছে। আগামী সপ্তাহে বিএনপির মিটিং আছে। দেখবে সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত একজন সাংসদ। তিনি এখানেই ছিলেন দশ বছর। তিনি লিডার। লিডারের উপর লিডারি করে এখন সাংসদ। এখানকার বোকা মানুষের টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে দলের নেতার হাতে দেননি কোনদিন। নিজে নিয়ে যেতেন দেশনেত্রির কাছে। এভাবে বাংলাদেশে নিজের নাম করেছে। দলের কাছে বিশেষ কর্মি হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে নমিনেশন নিয়ে একবারে সাংসদ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের বর্তমান আইনে বিদেশী নাগরিকত্ব থাকলে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করা যাবেনা বিধায় তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করেছেন। তিনি সিলেটের বিয়ানি বাজার থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

তাহলে আমার ধারনা ভুল হল বাহার ভাই। এখান থেকেও বাংলাদেশের রাজনীতি করে লাভবান হওয়া যায়!

অবশ্যই! সরল মানুষকে ধোকা দিতে না জানলে কোনখানেই রাজনীতি সফল হয়না। দেশে বা বিদেশে। বাহার বলল। শুধু রাজনীতিই নয়, এই স্বপ্নের দেশে অনেকেই আসে অনেক নিয়ত নিয়ে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে। কেউ আসে অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য, কেউ আসে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। কেউ আসে জীবন উপভোগ করার মানসে, কেউ আসে জীবন গড়ার মানসে। আসে খুনি, অপরাধী, রাজনৈতিক নেতা, পাতিনেতা, তস্য নেতা, রাজাকার, পীর মুর্শিদ, পুরোহিত, পন্ডিত, হস্তরেখাবিশারদ, যাদুকর, নায়ক, নায়িকা, গায়ক, গায়িকা, বুদ্ধিজীবি, কবি, সাহিত্যিক এমনি অনেক। সকলের স্বপ্ন হল ডলার। কারও স্বপ্ন পূর্ণ হয়, কারও আংশিক পূর্ণ হয় আবার কারও অপূর্ণ থেকে যায়। তবে অস্থায়ীভাবে যারা আসে তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক। এই প্রবাসী বাঙালীকে উপকার করা। সাহায্য করা।

কি বলছেন বাহার ভাই! আমি তো কিছুই ধরতে পারছিনা! আনিস বলল। এরা প্রবাসীকে সাহায্য করবে কি করে?

তোমাকে একটু ধরিয়ে দেই। বাকিটা বুঝে নিও। এই ধর নেতা যখন বাংলাদেশ থেকে আসে কর্মি দর্শনে তখন তিনি বাংলাদেশ থেকেই নিয়ত

করে আসেন। আনুমানিক কত কর্মিকে সাহায্য করতে হবে। সেভাবে তিনি রাজনৈতিক দলের প্যাড, সিল দিয়ে অথবা সিলটা সাথে নিয়েই আসেন। নেতারা জানেন এখানে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের কাগজ লাগে। যাদের কাগজ লাগে তারা জানতনা কি ধরনের কাগজ লাগবে, কোন্ রাজনৈতিক দলের কাগজ লাগবে। কারন এইসব মানুষ কোনদিনই রাজনীতি করেনি। তারা অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক দেশ ঘুরে, বহু বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়ে তবে এই দেশে এসে পৌছতে পেরেছে। এখানে পৌছার পরই বুঝতে পেরেছে এদেশে থাকতে হলে কাগজ লাগবে, আর কাগজ পেতে হলে কয়েকটা পথের একটা সোজা পথ হল রাজনৈতিক আশ্রয়। রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রকারভেদ আছে। এখন ১৯৯২ সাল। বিএনপি ক্ষমতায়। অতএব আওয়ামীলীগ হিসেবে দরখাস্ত মারতে হবে। কি কি লিখতে হবে তা বাতলে দেবে বাদলের মত আরও কয়েকজন আছে তারা। তখনই দলের কাগজপত্র দাখিল করতে হয়। এইসব কাগজপত্রের জন্য দেশে যেতে হয়না। এখান থেকেই জোগাড় হয়। যেমন এই নেতারা আসেন তৈরী হয়ে। যার যে রকম কাগজের প্রয়োজন সেভাবেই লিখে দেন। তবে মাগনা নয়। তার বিনিময়ে বেশ বড় রকমের একটা অংক প্রদান করতে হয়। নেতারা সে অংকের পরিমান নির্ধারণ করেন ব্যক্তিবিশেষের উপর, তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। তবে তিনশ ডলারের কম কোন কাগজে সই করেন না। এই স্বপ্ন নিয়েই নেতারা কর্মি দর্শনে আসেন। দলের কাজ করার জন্য। পকেট ভারী করার জন্য।

একটু একটু বুঝলাম নেতাদের কথা। রাজাকার আসে কেন?

কয়েক মাস পর পরই ওরা আসে ওয়াজ নসিহত করার জন্য। এই কাফেরের দেশে থেকে আমাদের ধর্ম ঠিক আছে কিনা পরখ করে নসিহত করে যান। এখানে বেশ কিছু জামাতী, রাজাকার আর ধর্মপ্রান মুসলমান আছে। তার ওয়াজ শুনতে যায়, ওয়াজের নামে শুরু করে আসলে রাজনৈতিক বক্তৃতা। মানুষ বুঝতেই পারেনা এই ধর্মের নামে রাজনৈতিক ব্যবসাটা। এমনভাবে মানুষকে হিপনোটাইজ করে ফেলে যে কবরের আজাব থেকে বেহেস্তে যাবার পুলছেরাত পর্যন্ত সমস্ত পথে সব আগাছা পরিষ্কার করার দায়ীত্ব নিয়ে নেয় এই আল্লাহর খাস বান্দা। দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তির জন্য তিনি পথ বাতলে দেন। এর বিনিময়ে দান করতে হয়। ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য যারা কাজ করে তাদেরও একটা খরচ আছে। এ পথে যারা দান করে তাদের কত লক্ষ কোটি নেকী মিলবে তার একটা পরিষ্কার হিসাব তিনি দিয়ে দেন। আর ধর্মপ্রান মুসলমান এই নেকী অর্জনের জন্য তাদের সবকিছু দান করতেও পিছপা হননা। তাই ওরা যখন দেশে ফিরে যায় তখন হাজার হাজার ডলারের ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে যায় আল্লাহর কাজে ব্যয় করার জন্য। আল্লাহর নামে ধর্মের জন্য মুক্তহস্তে যে দান করা হয় তার হিসেব রাখা বা হিসেব দেয়া মুকরুহ্ তানজিহি।

আনিস হেসে উঠল। বলেন কি এসব! এ যে দেখছি বিনা পূজিতে বিরাট ব্যবসা! পীরসাহেবরা আসে কেন?

পীরসাহেবরা আসে তাদের মুরীদ দর্শনে। কে কোথায় কোন বিপদে আছে, কার স্ত্রীর সাথে বনিবনা হচ্ছেনা, কার চাকরি নেই, কার দেশের বাড়ীতে ঝামেলা যাচ্ছে জমিজমা নিয়ে এসবের প্রতিকার করার জন্য পীরসাহেবরা আসে। তারা তাবিজ, পানি পড়া আর দোয়া করে সব বালামুসিবত দূর করে দেয়। বিনিময়ে যে যা দেয়। তাদের নির্দিষ্ট কোন দাবী নেই। তবে তাবিজের একটা হাদিয়া আছে। সেগুলোর খরচ

উঠানামা করে। তাতেই যথেষ্ট আয় হয়। পীরের প্রধান উদ্দেশ্য হল কিছু মুরীদ তৈরী করা। এই মুরীদরা দরগাহে প্রতি মাসে বা বছরে কিছু দান করে। পীর সাহেবরা একটা তালিকা তৈরী করে সাথে নিয়ে যায়। নিজেরা না আসতে পারলেও কোন অসুবিধে নেই। যথাসময়ে মুরীদের কাছে চিঠি পৌছে যায়। তখনই মুরীদের স্মরণে আসে যে পরকালের কাজে গাফিলতি হচ্ছে। যথাসময়ে তারাও সাধ্যমত ডলার পাঠিয়ে দেয়।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছি এখন? আনিস জিজ্ঞেস করল।

এখন চল আমার বাসায়। খেয়েদেয়ে চলে যেও বাসায়।

নিখিল আবার ধরিয়ে দিল। বলল, ব্যবসার কনট্রাক্ট নিয়েও আসে অনেকে। যেমন নায়ক-নায়িকারা, গায়ক-গায়িকারা। তাদের যারা স্পন্সর করে আনে তারা কত টাকার বিনিময়ে তা আগে থেকেই বলে কয়ে আনতে হয়। তারা এখানে এসে অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠানে আমদানি আয় থেকে তাদের নির্ধারিত টাকা দেয়া হয়। কেউ আসে কন্ট্রাক্ট ছাড়া। এখানে আসার পর অনুষ্ঠান করে যা আয় হয় তাই দেয়া হয়। তার মধ্যে আছে যাদুকর, হস্তরেখা বিশারদ এসব। আমাদের পন্ডিত পুরোহিত ধর্মযাজক আসে পূজাপার্বণ সামনে রেখে। তারা টাকাপয়সা ছাড়াও অনেক জিনিষপত্র নিয়ে তবে দেশে ফেরেন। তাতে দুচার বছর তাদের আর কোন কাপড়চোপড় কিনতে হয়না।

এমন সময় বাহারের ঘরের দরজায় পৌছল তারা। ঘরে ঢুকেই বাহার বলল, এক কাপ চা হলে খুব জমত। বিন্দু, তুমি কি ব্যস্ত? কোন সাড়া নেই। বাহার বুঝতে পারে ঘরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস। যদি এক ডাকে সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে মেজাজ সুবিধের নয়। দ্বিতীয়বার ডাক দেয়ার নিয়ম নেই। তাই নিখিলকে বলল, তোমরা বস। আমি চায়ের পানি চড়িয়ে আসি।

দু'বেডরুমের বাসা বাহারের। চায়ের পানি চড়িয়ে বিন্দুর খোঁজে বাচ্চাদের বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখে বিন্দু মাষ্টারি করছে। বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক শেষ করাচ্ছে। অতএব সরে পড়া বিধেয়।

চায়ের টেবিলে বসে আনিস বলল, বাহারভাই, সকলেই তো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসে বুঝলাম। সে উদ্দেশ্যটা হল পকেট ভারি করা। কিন্তু বুদ্ধিজীবি আর কবি সাহিত্যিক আসে কেন?

বুদ্ধিজীবি আর কবি সাহিত্যিক হল একটা দেশের প্রাণ। তাঁরা এখানে আসে নিছক ভ্রমনের উদ্দেশ্যে সাথে কিছু বুদ্ধি ছড়িয়ে দেয়া। অনেক সংগঠন তাদেরকে দাওয়াত করে নিয়ে আসে। টিকেট পাঠিয়ে দেয়। তুমি একটা জিনিষ খেয়াল করে দেখ কোন কবি সাহিত্যিকই ধনী নয়। একজন ছাড়া। কারণ তারা ব্যবসায়ী নয়, উদাসী - বলতে পার অনেক ক্ষেত্রে বাউন্ডেলের মত ঘুরে বেড়াতে পারলেই খুশি থাকে। তালে থাকে কিভাবে খোলামনে ঘুরে বেড়ানো যায়। আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতেই তারা বেশি আনন্দ পায়। দেশ ভ্রমনের সুযোগ পেলে তো কোন কথাই নেই। প্রবাসে তাদের প্রয়োজন আছে। প্রবাসের গতানুগতিক জীবনে একটু ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। প্রবাসীরা তাদের নিয়ে আড্ডা দিয়ে, জলসা করে আনন্দ উপভোগ করে। প্রবাসী কিছু অতি উৎসাহী আছে, যাদেরকে আমি বলি চামচা, তারা অদ্ভুত সব কান্ড করে বসে কখনও। তাদের চামচাগিরি প্রমানের জন্য। যার যতটুকু সন্মান প্রাপ্য তাকে অবশ্যই ততটুকু প্রদান করতে হবে। উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন না করা একটা অপরাধ।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও আনিস বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছে আজ কোথায় যাওয়া যায়। আমান চলে গেছে লাইব্রেরীতে। তারপর কাজে চলে যাবে। চাচি বলেছেন প্রতিদিন একটা করে খবরের কাগজ কিনতে। প্রয়োজন না থাকলেও কিনতে হবে এবং পড়ার ইচ্ছে না থাকলেও অন্তত হেড লাইনগুলো দেখতে বলেছেন। তার মনে হল বাংলা পত্রিকার কথা। স্থির করল গোসল করে কিছু খেয়ে একবারে বেরিয়ে যাবে। উদ্দেশ্য বিহীন ঘুরবে। সাব ওয়েতে যাবার পথে একটা বাংলা এবং একটা ইংরেজি পত্রিকা কিনে নিয়ে যাবে আর সাবওয়েতে বসে পড়বে।

স্পাইস অব ইন্ডিয়াতে বাংলা পত্রিকার জন্য ঢুকতেই মুখোমুখি হয়ে গেল সৈয়দ ভাবীর। আনিস থমকে গেল! কয়েক মুহূর্ত! কি বলবে! কেমন আছে জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল।

সৈয়দ ভাবী ঝরনার কলতানে কল কল করে উঠল। এইযে আনিস ভাই! কেমন আছেন? আপনার ফোন নাম্বার হারিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই যে এক টুকরো কাগজে ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন পরে তা আর খুঁজে পাইনি। কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই ফোন করতে পারিনি। কেমন আছেন?

ভাল আছি। আপনি কেমন?

ভাল, আপনি এই সকাল বেলা এখানে?

একটা পত্রিকা নিতে এলাম।

আপনাদের ওদিকে কি বাংলা কাগজ পাওয়া যায় না?

আমি তো বাসা বদল করেছি। এই তো কাছেই চলে এসেছি আমার বন্ধুর কাছে।

তাই নাকি? তাহলে খুব ভাল হল। আমাদের বাসা তো এখান থেকে কয়েকটা ব্লক। ভালই হল যখন তখন দেখা হবে।

আপনি কি বাজার করতে এসেছেন?

না, একটা পত্রিকা নিতে এলাম। আমার তো সময় কাটে না। বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে অকাজে সময় কাটে। স্কুল তো এই দোকানের পেছনেই। বাংলা পত্রিকা সব কয়টা পড়ি। নিজেই নিয়ে যাই। আজ কি করবেন?

একটু ঘুরতে বের হচ্ছি।

তাহলে চলুন আমাদের বাসায়। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আজ নয়, আর একদিন যাব।

আর এক দিনও যাওয়া যাবে, আজ গেলেও আপনার এমন কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। চলুন।

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে সৈয়দ ভাবী জিজ্ঞেস করল, বলুন আছেন কেমন?

আমি তো ভালই আছি। আপনাদের বাসা থেকে ফিরে এসে আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। দুদিন চলে যাবার পরও যখন ফোন করেননি, তখন ভাবলাম বোধ হয় আমার কথা আর মনে নেই।

তাই কি হয়! আপনার কথা মনে থাকবেনা! এদিকে আমি আপনার জন্য পাত্রীর সন্ধান করছি। আমার খোঁজে ভাল একজন পাত্রী আছে। বাংলাদেশে তো খোঁজে পেলেন না, দেখি আমি দিতে পারি কিনা।

আমি যে বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি আপনি কি করে বুঝলেন?

আপনি অস্থির হননি। চাচা হয়েছেন। চাচার ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পারেন আপনার বিয়ে দিয়ে দিতে চান। তিনি তো প্রায় রবিবারই

আমাদের এখানে আসেন। আর ওসব আলাপ হয়। তার নিজের সন্তান না থাকায় আপনার প্রতি বেশি টান। নিজে তো কোনদিন এ সব চিন্তা করেননি। এখন আপনাকে দিয়ে তার স্বপ্ন কাজে লাগাতে চান। শুধু বিয়েই নয়, তিনি ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে দেখতে চান।

আপনি তো তাহলে আমার চেয়ে বেশি জানেন দেখছি। পাত্রীটা কোথায়? এখানে না বাংলাদেশে?

এখানেই আছে। কলেজে পড়ে। দেখতে খুবই সুন্দরি। আপনার সাথে মানাবে ভাল।

দেখতে আপনার মত?

আমার চেয়েও সুন্দরী।

আপনার চেয়ে সুন্দরী? আমার চোখে তো আজও পড়েনি। তাহলে তো একবার দেখতে হয়।

কথা বলতে বলতে তারা সৈয়দ মহলে পৌঁছে গেল। ঘরে ঢুকে সৈয়দ ভাবী বলল, আজ আমার এখানে খেয়ে যাবেন। আমি রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনার জন্য। দুপুরে কিছু রান্না করিনা সচরাচর। আসুন রান্না ঘরেই বসুন, রান্নাও হবে গল্পও চলবে।

ভাবীর রান্নাঘর বেশ বড়। তিনদিকে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সেলফ লাগানো। বড় সাইজের চারটা চুলা, নীচে ওভেন। চুলার পাশে বিরাট আকারের ফ্রিজার। তার উল্টোদিকে ছোট একটা টেবিল। টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। আনিসকে বসতে বলে ভাবী ফ্রিজ থেকে এক পিস কেক বের করে টেবিলে রেখে বলল, আপাতত এটা চলুক। জিজ্ঞেস করল কি চলবে? চা, কফি না কোন জুস?

কফি।

ইনষ্টেন্ট কফি আছে। তা চলবে?

কোন অসুবিধে নেই।

দু কাপ কফি করে টেবিলে বসে সৈয়দ ভাবী জিজ্ঞেস করল,এত মেয়ে দেখেও বাংলাদেশে একটা পাত্রীও পছন্দ করতে পারলেন না কেন?

পছন্দ হয়নি বলে পছন্দ করা গেলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনে ভাবী হেসে ফেলল। বলল, আমার কাছে কিছু ছবি আছে। খাওয়ার পর কিছু ছবি দেখাব আপনাকে।

ছবির কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন। আপনার পরিবারে আর কে কে আছেন?

আমার মা আর একমাত্র ভাই। ভাই চাকরি করেন পূবালী ব্যাংকে। বলতে পারেন মিডিয়াম বস।

লেখাপড়া করেছেন কোথায়?

লেখাপড়া আর হল কই! থার্ড ইয়ারে থাকতেই বিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেল। রোকেয়া হলে থাকতাম। মানুষের জালাতন সহ্য করেও ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শেষ করে বিয়ে করব। অনেক দিক থেকে অনেক বিয়ের প্রস্তাব ছিল। আমার বাবা নেই। অকালে মারা গেছেন। মামা আমার অভিভাবক। তিনি বাছাই করে করে বাদ দিতেন। একদিকে মিলে তো অন্যদিকে মিলে না। সেই অনেক প্রস্তাবের মাঝখানে মামার বন্ধু নিয়ে এল তার ভাতিজার জন্য। এই সৈয়দ সাহেবকে। বাড়ী বরিশাল। আর আমাদের বাড়ী ঢাকা। আমেরিকার স্বপ্ন আমরা কখনও দেখিনি। আমেরিকান পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার পরেই যেন আমাদের স্বপ্নের পরিবর্তন হল। মনে হল আকাশের চাঁদ। সকলের মনই যেন চলে গেল আমেরিকার পক্ষে। পাত্রের টাকা পয়সা আর ধন দৌলতের কাছে পাত্রের বয়স এবং লেখাপড়া আর আমার লেখাপড়া চাপা পড়ে

গেল। এমন পাত্র নাকি হাতছাড়া করা যায়না। আমি ভাগ্যবতী! এমন বর মিলেছে! আমি নিজেও স্বপ্ন দেখলাম নতুন করে। চলে এলাম নতুন মানুষের সাথে নতুন জীবনে যা কোনদিন কল্পনাও করিনি।

আসলেও আপনি ভাগ্যবতী! আমেরিকান ধনী লোকের স্ত্রী, সুখী জীবন! আর কি চাই?

সুখ যে কার কাছে কিভাবে ধরা দেয় ঠিক বুঝতে পারি না। কে কিভাবে সুখী হয় তাও জানি না। তবে ধন দৌলত যে মানুষকে সব সময় সুখ দিতে পারে না তা বুঝেছি।

বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা।

বুঝবেন কি করে? বাইরে থেকে তো মনে হয় টাকা থাকলেই খুব সুখ। আসলে এই টাকা পয়সার কি প্রয়োজন সেটাই বুঝে উঠতে পারিনি। টাকার মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ভুলে যায় জীবনের আরও প্রয়োজনের কথা। বিয়ের প্রথম বছরটা সৈয়দ সাহেব মাঝে মাঝে কিছু সময় দিত। শান্তর জন্মের পর থেকেই সে তার ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাকে সামান্য দেবার মতও সময় তার হাতে নেই। সকাল আটটায় যায় আর ফেরে রাত নয়টা বা দশটায়। শুধু রবিবারটা তার হাতে রাখে। সেই রবিবারটাও চলে যায় জলসা করে। শুনি এখানে অনেক রকমের অনুষ্ঠান হয়। গান বাজনা ইত্যাদি। কোনদিন কোন অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি। কোথায়ও একটু বেড়াতে যাবার সময়ও হয়না। মাঝে মাঝে নিয়ে যায় কোন ইসলামি জলসায়। কখনও গ্রোসারী কিনতে যাই। এমন একটা লোকের ঘর করছি যার ওসবের প্রতি কোন ধারনা নেই এবং ইচ্ছেও নেই। মনের ইচ্ছেগুলো যদি পূরণ না হয় তাহলে কিসের সুখ! কি প্রয়োজন এই ধন দৌলতের?এখানে জীবন একটা গন্ডীর ভেতরে চলছে। স্বপ্নের সাথে কোন মিল নেই। তার চেয়ে বোধ হয় দেশের জীবনই ভাল ছিল।

আপনার ইচ্ছেগুলো কি?

খুব বেশি না। কাজশেষে স্বামী বাড়ী ফিরবে। তাকে নিয়ে গল্প করা। কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া, ছবি দেখা, গান শোনা এসব। মাঝে মাঝে কোথাও চলে যাওয়া সারাদিনের জন্য। এখানে সামারে বাঙালিরা পিকনিক করে। আমারও ইচ্ছে হয় যোগ দেই। সৈয়দ সাহেবকে বললে তিনি বলেন তার সময় নেই। বেশি পীড়াপিড়ি করলে বলে, জামাতের অন্য ভাবীদের সাথে ব্যবস্থা করে কোথায়ও যেতে পার। এসব মহিলাদের চালচলন আমার একদম ভাল লাগেনা। একা আমি কোথাও গেলে আমার মনে হয় আমি অসহায়, এতিম। তাই কোথাও একা যেতে পারিনা। আর এইসব কাজগুলো একা উপভোগ করা যায় না।

আপনি কি খুব ছবি দেখেন?

এক সময় দেখতাম। তবে খুব বেশি নয়। ভাল ছবি এলে ভাইয়ার সাথে দেখতে যেতাম। বিশেষ করে উৎসবের ছবিগুলো বাদ দিতাম না। আর ছিল আমার গান শোনার বাতিক। রেডিওতে কখন কি গান হবে সব শুনতাম। শেষ পর্যন্ত ভাইয়া একটা টু ইন ওয়ান কিনে দিলে কেসেট সংগ্রহ করতে থাকি। অনেক সংগ্রহ ছিল আমার। বই পড়ার অভ্যেস ছিল প্রচুর। ভাল বই ভাইয়া এনে দিতেন। কোন কোন বই ছাড়তে পারতাম না শেষ না করে।

এখানে আপনার সময় কাটে কি করে?

কিছু বাংলা ছবি আছে, আর কিছু গানের কেসেট আছে। তাই বার বার দেখি। মাঝে মাঝে একাই যাই চার্চ এভিনিউতে। বাঙালি গ্রোসারীতে কিছু কেসেট পাওয়া যায়। ভাল ভাল ছবি দেখা, ভাল ভাল

বই পড়া আমার অভ্যেস। এখানে কোন বই পাই না। ঘরে কিছু ইসলামিক বই আছে। তা শেষ করে ফেলেছি। সময় একদম কাটে না। রান্না শেষ। টেবিলে আসুন।

ডাইনিং রুমে সব নিয়ে ভাবী বলল, বসে পড়ুন। বেশি কিছু করিনি। আর একদিন ঠিক ভাবে মনের মত করে আপনাকে খাওয়াব। আজকে শুধু এই।

আনিস দেখল এতবড় টেবিলটা ছোট বড় বাটিতে ভর্তি। এতসব কি জিজ্ঞেস করতে ভাবী একটা একটা করে ঢাকনি উল্টিয়ে বলল, এটাতে সর পুটি, এটা গরুর মাংশ, এটা মুরগী, এটা ডাল। আপনার যা যা ভাল লাগে সেগুলো নিন।

এই যদি হয় আপনার সাদা মাটা খাবার তাহলে মনের মত খাবারটা কি হবে? সেখানে কতটা আইটেম থাকবে? এতসব করলেন কখন?

কিছু আগেই করা ছিল। বলে একটা একটা করে অতি যত্নে আনিসের পাতে তুলে দিচেছ। কোন আপত্তি শুনছেনা।

এক সময় আনিস বলল, ভাবী, এখন পর্যন্ত আপনার নামটাই জানা হলনা।

আমার নাম? আমার নাম লতা।

খুব সুন্দর নাম তো! লতা মুঙ্গেষ্করের গলার সাথে আপনার গলার হুবুহু মিল আছে। গাইলে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ভাল করতে পারতেন।

কি যে বলেন! কার সাথে কি তুলনা!

আপনি নিজে জানে না আপনার গলা কেমন। একটা কাচাঁ লঙ্কা হবে?

হ্যা, আছে বলে লতা ফ্রিজ থেকে কাচা মরিচ এনে টেবিলে রাখল।

আনিস জিজ্ঞেস করল, আপনি তো ভাল ছবি দেখেন। বলুন তো, এ কথাটা কোন্ ছবিতে ছিল? "একটা কাচাঁ লঙ্কা হবে?"

লতা একটু ভেবে নিয়ে খুশিতে নেচে উঠল। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন হাসছে। সে ভুলে গেছে কোথায় সে কথা বলছে। হয়ত বা তার অতীতে ফিরে গেছে। অতীতের কোন দৃশ্য বা ঘটনা নিয়ে মানুষ আলোচনা করে ব্যথিত হয়, আনন্দিত হয়। আনন্দের ঘটনা নিয়ে যতবার আলোচন করে ততবার তা ভোগ করে। লতা যেন তেমন একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে।

বলল, হ্যা, মনে পড়ছে! অশনি সঙ্কেত ছবিতে ছিল। সেই উপবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মন খেতে বসে একটা লঙ্কা চেয়েছিল। ছবিটা দেখেছিলাম ভাইয়ার সাথে। সেই ছবির কথা মনে হলে সন্ধ্যা রায়ের জন্য এখনও আমার চোখ ভিজে ওঠে। এক মুঠো ভাতের জন্য সে কেমন একটা অদ্ভুত লোকের সাথে চলে গেল মনে হলেই আমি চোখের জল রাখতে পারি না! সেই থেকে সন্ধ্যা রায় আমার প্রিয় অভিনেত্রী বা নায়িকা। তার আগে ছিল কবরী।

তাহলে নায়িকা বদল করেছেন?

আমি করিনি, তার অভিনয়ে আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। তার আগে তার অভিনয় আমি দেখিনি। তার অভিনয় দেখে বুঝেছি কত নিখুত অভিনয় মানুষ করতে পারে।

আপনার নায়ক কে?

আমার নায়ক? কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

মানে আপনার প্রিয় নায়ক কে?

ও! আমার প্রিয় নায়ক আনোয়ার হোসেন।

কোন্ ছবিতে অভিনয় করে?

সিরাজউদ্দৌলা ছবিতে তার অভিনয় দেখে বুঝেছি কতবড় অভিনেতা তিনি।

আর গায়ক?

এটা আমি ঠিক করতে পারিনা। কোন্ গায়ক যে আমার প্রিয় তা ঠিক বলতে পারিনা। যখন যার গান শুনি মনে হয় সেই আমার প্রিয়। সেই বোধ হয় শ্রেষ্ট। আমার অনেক প্রিয় গায়ক। যেমন আধুনিক গানে কেউ, রবীন্দ্র সঙ্গীতে কেউ, গজলে কেউ, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি বা লালন গীতিতে কেউ।

কোন্ গায়িকার গান আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?

সেও তো তালগোল পাকানো প্রশ্ন। বলতে পারব না। কোন সময় প্রতিমা, কোন সময় লতা, কোন সময় সুমন কল্যাণপোর। কোন ঠিক নেই। একটা সময় ছিল গান শুনে বেশি সময় কাটত। এখানে এত সব কেসেট পাওয়া যায় না। সামান্য যা আছে তাই বার বার শুনি।

তাহলে আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতও শোনেন? ভাল লাগে?

আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল লাগত না। ভাইয়া একদিন একটা কেসেট এনে শুনছিল। হঠাৎ গানের কলি শুনে আমি থমকে গেলাম - যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে ... । সেই গান আমাকে বিমোহিত করে দিল। বার বার শুনলাম। সেদিন থেকে শুরু হল রবীন্দ্র সঙ্গীত যোগাড় করা। এক সময় সব গান বাদ দিয়ে শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত। বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুধু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরাই নয়, বাংলাদেশের শিল্পীরাও কম নয়। পাপিয়া, বন্যা পশ্চিম বাংলার অনেক শিল্পীর সাথে পাল্লা দিতে পারে। আমার কয়েক ডজন কেসেট ছিল। এখন সে জগতেই নেই। পরিস্থিতিতে মানুষের অভ্যাস বোধ হয় বদলে যায়। আমারও তাই হয়েছে।

এ কথা ঠিক নয়। মানুষই পরিস্থিতি পরিবেশ বদলাতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার নিজের পরিবেশ বদলাতে পারেন। গান আপনার পছন্দ। নিজে যোগাড় করে ঘরের পরিবেশ বদলাতে পারেন। আপনার পছন্দের সব গান বাংলাদেশ থেকে আনাতে পারেন। সবই সম্ভব।

এসব কাজে একা একা কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। সাথে কেউ না থাকলে আনন্দ পূর্ণ হয়না। এই একটু আগে বললেন কাঁচা লঙ্কার কথা। সৈয়দ সাহেবকে এসব বললে সে কিছুই বুঝবেনা। আনন্দ পাবার প্রশ্নই আসে না।

তা হলে একাই ভোগ করবেন।

পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা একা ভোগ করা যায় না। অপূর্ণ থেকে যায়।

মানুষের সব সময় সব কিছু পূর্ণ হয় না। তারপরও চলতে হয়। কিছু থেমে নেই। এই অপূর্ণতা নিয়েই চলছে সবকিছু।

চেষ্টা তো তাই করছি।

খাওয়া শেষে লিভিংরুমে বসে ভাবী জিজ্ঞেস করল কি দেখবেন? বাংলা না হিন্দি ফিল্ম?

বাংলা কি আছে?

অনেক আছে। বাংলাদেশের আর কোলকাতার মিলিয়ে প্রায় ষাট আর হিন্দি হবে চল্লিশটার মত। ভাড়ায় এনে দেখার পর যেগুলো আমার ভাল লাগে তা ফেরত দেইনা। দাম দিয়ে দিই।

বাংলা লাগান। সত্যজিত রায়ের কিছু থাকলে দেখান।

পথের পাঁচালী আছে। প্রিন্ট ভাল নয়।

তাও ভাল। ওটা আবার দেখব।

ভিসিআর-এ কেসেট দিয়ে বলল, আমার বোনের ছবিগুলো দেখুন বলে একটা এলবাম নিয়ে পাশে বসল। একবারে গায়ে গায়ে লেগে। এলবামটা আনিসের কোলের উপর রেখে আনিসের দিকে ঝুকে এলবামের পাতা উল্টাচ্ছে লতা। তার নিঃশ্বাস এসে আনিসের বুকে লাগছে। মাথাটা নীচু করে একটা ছবি দেখিয়ে বলল, এটা আমার বোন। লতার গায়ে, নাকি চুলে নাকি তার সারা অঙ্গে একটা সুবাস ছড়িয়ে আছে। সে সুবাস আনিসকে আনমনা করে দিচ্ছে। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছু দেখছেনা। কোথায় যেন সে হারিয়ে গেছে। লতার কনুইটা এসে তার বুক স্পর্শ করছে, একটা হাত এলবামের পাতা উল্টাতে গিয়ে আনিসের উরুতে এলিয়ে আছে। কোন ছবিটা সে দেখছে সেই জানে। লতা বলল, কি? কেমন দেখতে? কিছু বলছেন না যে!

দেখতে তো সুন্দরী। কিন্তু আপনার মত নয়।

আমার চেয়ে কম কিসে? সামনাসামনি দেখলে বুঝবেন সে আমার চেয়ে সুন্দরী। আর এটা হচ্ছে আমার ফুফুর মেয়ে। এবার আই এ পড়ে। আর এ হলো আমার ..... এমনি করে একে একে সমস্ত এলবাম দেখাতে লাগল। অনেক সময় নিয়ে। আনিসের ইচ্ছে ছিল পথের পাচালী ছবিটা আর একবার দেখার। লতার হাজার কথার মাঝে কখন কিভাবে যে একসময় শেষ হল তা বুঝতেই পারেনি সে। বিকেলে চা খেয়ে আনিস বিদায় নিল। লতা বলল, এখানে যে পাত্রির কথা বলেছিলাম, আগামি সপ্তাহে সে এখানে আসবে। তখন আপনাকে আসতে বলব।

ক্রমশঃ...